হিমালয়ের মানুষ

সুনীল চৌধুরী

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৫৮

প্রকাশক : দিলীপ মিত্র, ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : মণীন্দ্রনাথ মান্না, পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৫।১, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৬

শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

দেওবনের দিগন্তে

ত্রিশূলী তীর্থের পথে

অভিযাত্রী তীর্থ সুন্দরডুঙ্গা

মালয় ভ্রমণ ও গাইড

পাহাড় খেলা (শৈলারোহণ)

দয় হতে (যন্ত্রস্থ)

প্রকাশক : দিলীপ ।

মুদ্রাকর : মণীন্দ্রন।

১৫।১, ঈশ্বর ।

আট

লোহারক্ষেত ডাকবাংলো।

সবুজ অরণ্য আর পাহাড় ঘেরা লোহারক্ষেতে দুর্যোগের ঘনঘটা। একটানা ঝড় আর বৃষ্টি চলেছে সেই বিকেল থেকে। এখন আকাশের চেহারা আরো খারাপ আরো ভয়ংকর। দিনের আলোয় টান ধরেছে অনেক আগেই। সন্ধ্যা হল বলে।

ডাকবাংলোর প্রশস্ত টানা বারান্দায় একদল পাহাড়ী নারী-পুরুষ ডাক্তারের মুখের দিকে আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে। ডাক্তার একমনে রোগী দেখছে, ওষুধ দিচ্ছে। গ্রামে ডাক্তার এসেছে খবর পেয়ে অসুস্থ মানুষগুলো ছুটে এসেছে বৃষ্টি মাথায় করে। ডাক্তার অমিয় হাটি হৃদয়বান চিকিৎসক, রোগী পেলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়।

ডাকবাংলোর বারান্দার এক কোণে সাহেবী আমলের বিরাট আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বসে বাইরের বর্ষণক্লান্ত প্রকৃতির রূপ দেখছি আর ভাবছি হিমালয়ের এই মানুষগুলোর কথা।

হিমালয়ের পথে পথে ঘোরার জীবনে অনেক মুখ অনেক হৃদয় পেয়েছি আর নিজের সংগ্রহের ঝুলিতে তুলে নিয়েছি। এদের জীবন বিচিত্রার কথা একান্তে ভাবতে বসলে একটা মুখই বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে—সে মুখ রাণীক্ষেত টুরিস্ট অফিসের মিঃ পাণ্ডের।

প্রথম দিনের আলাপেই উনি বলেছিলেন, হিমালয়ে যাচ্ছ, হিমালয়ের মানুষগুলোকে দেখো, বুঝতে চেষ্টা কর ওদের মন। তোমার চোখ আর মন যদি খোলা থাকে তাহলে হিমালয়ের মানুষের মধ্যে তুমি এমন জিনিস পাবে যা তোমার সারা জীবনের এক পরম সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

আজও মিঃ পাণ্ডের হাসি হাসি মুখ দেখছি মানসচক্ষে। কিন্তু

আমি যে স্বস্তি পাচ্ছি না। বিশ্রী একটা মানসিকতায় এই হিমালয়ের গহনে এসেও শান্তি পাচ্ছি না। প্রতি মুহূর্তে একটা কুৎসিত মুখ মিঃ পাণ্ডের হাসি হাসি মুখের ওপর ছায় ফেলছে।

সে মুখটাও একটা হিমালয়ের মানুষের। এ মুখ আমার দেখাব ভাঁড়ারে আরও একটা অমূল্য সম্পদ হতে পারত। কিন্তু হয়নি, হবেও না নিশ্চয়ই। এ মুখ এই লোহারক্ষেত গ্রামের মুখিয়া মালগুন-জারের।

আমার একান্ত ভাবনায় বাধা পড়ল হঠাৎ।

অন্ধকার আর দুর্যোগ মাথায় করে একটি যুবতী মেয়ে এল ডাকবাংলোয় ডাক্তারের কাছে। সঙ্গে দুটো পাহাড়ী মানুষ। হাতে ওদের মোটা মোটা লাঠি আর লণ্ঠন।

হ্যাজাগ লাইটের উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম মেয়েটির আলুথালু বেশ উসকো-খুসকো চুলে বৃষ্টির জল টলমল করছে। চোখ দুটোয় কোনো আসন্ন বিপর্যয়ের ছায়া কাঁপছে। এমন একটি উমনো ঝুমনো চেহারার মেয়ের সঙ্গে দুই লাঠিধারীর সদর্প প্রবেশ দেখে আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্যান্য রোগী ও ডাক্তার হাঁ করে তাকিয়ে আছে আগন্তুকদের দিকে।

মেয়েটি হঠাৎ ডাক্তারের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্নার মধ্য থেকে বলল, ডাক্তার সাব আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন।

অমিয় বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার স্বামীর কি হয়েছে?

-- বড় ভারা বেমার ডাক্তার সাব। তিন চার দিন বিলকুল বেহুঁস। কিছু খাচ্ছে না। এখন পায়খানা-পেচ্ছাবও বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কাশি হচ্ছে। কাশির সময় মুখ লাল হয়ে বেঁকে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে যেন হাওয়াই জাহাজ চলার গুরগুর আওয়াজ। শ্বাসের কষ্টও হচ্ছে। কথাগুলো বলে মেয়েটি কাঁদতে লাগল।

অমিয় আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি করা যায় বলুন

তো? রোগীর যা অবস্থা শুনলাম তাতে কেস খুবই কম্‌প্লিকেটেড বলে মনে হয়। না দেখে ওষুধ দেওয়া ঠিক হবে না। একবার দেখে আসতে পারলে ভাল হত।

আকাশের অবস্থা দেখে বললাম, এই দুর্যোগ আর অন্ধকারে যাবে কি করে?

—আমিও তো সেই কথাই ভাবছি।

মেয়েটি আমাদের আলাপের ভাব বুঝে নিয়ে আকুলভাবে বলল, আমি ডাক্তার সাবকে নিয়ে যাব। রোগী দেখা হয়ে গেলে আবার আমি ওঁকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব সাব। আমাদের নিজের গাঁ, তাছাড়া সঙ্গে আমার দুটো লোক আছে। ভয়ের কিছু নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের ঘর এখান থেকে কতটা পথ? চড়াই আছে খুব?

—সামান্য পথ। তবে অল্প চড়াই আছে। ডাক্তার সাবকে আমার লোক কাঁধে করে নিয়ে যাবে। কোনো তকলিফ্‌ হবে না। মেয়েটি হঠাৎ আমার হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলল, ডাক্তার সাব না গেলে আমার স্বামীকে বাঁচানো যাবে না। আপনি একটু বলুন বাবুজী।

মনের মধ্যে একটা ব্যথা দোলা দিয়ে গেল। ডাক্তারকে বললাম সাবধানে যেতে।

অমিয় একটা ছোট বাক্সে ওষুধ-ইন্‌জেকশন ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে ওয়াটার প্রুফ গায়ে চাপিয়ে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে গেল যুবতীটির সঙ্গে। লাঠিধারী লোকদুটো ছায়ার মতো গেল ওদের পিছনে।

ডাক্তার চলে যেতেই মালগুনজারের কুটিল মুখ আর লাল চোখ দুটো ভেসে উঠল চোখের সামনে।

ভারারিতে মালগুনজারের সঙ্গে প্রথম দেখা আমার। আমাদের স্বুন্দরডুঙ্গা অভিযানের পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলাম ওকে। অভিজ্ঞ লোক। কিন্তু পয়সার লালসা আর গরম মেজাজ যেমন ওর তেমনি দুর্বিনীত। প্রথম দিনই মদে চুর হয়ে বসেছিল আমার

সামনে। মালবাহকদের রেট এবং অন্যান্য নানা কথা আলোচনার সূত্রে ওকে প্রথমেই দর্শনীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—তোমার রেট কত ?

—বিশ রূপেয়া রোজ।

টাকার অঙ্ক শুনে মাথায় বাজ পড়েছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মালবাহকের রেট ?

—দশ টাকা আর খাওয়া।

ধৈর্য হারাচ্ছিলাম ওর দর শুনে। মাথা ঠাণ্ডা করে ওকে বিনীত-ভাবে বলেছিলাম, আমাদের বে-সরকারী দল, নিজেদের পয়সায় হিমালয়ে অভিযানে এসেছি। আমাদের দিকে যদি তোমরা না তাকাও তাহলে দাঁড়াই কোথায় ?

মালগুনজার উত্তর দিয়েছিল, টাকা না থাকে তো পিণ্ডারী দেখে ফিরে যান। পয়সা কম লাগবে।

মালগুনজারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব শুনে গা রি-রি করে উঠল। বললাম, কোথায় গেলে পয়সা কম লাগবে সে উপদেশ তোমার কাছে চাইনি।

মালগুনজার সামান্য দমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কত রেট দিতে চান ?

—গাইডের দশ টাকা রোজ, পোর্টারের সাত টাকা।

—ও রেট আমরা দিতে পারব না।

মালগুনজার এ-অঞ্চলের অভিজ্ঞ গাইড। ১৯৪৪ সালে বিদেশী অভিযানের সঙ্গে ও গেছে সুন্দরডুঙ্গা আর থারকোট অঞ্চলে। তাছাড়া এ-বছর বোম্বের একটি অভিযাত্রী দলের পথপ্রদর্শক ছিল। ওকে পেলে ভাল হত। দুর্গম পথে ভাল পথপ্রদর্শক ছাড়া এগনো যায় না।

—ঠিক আছে, তুমি যদি আমাদের পথ না দেখাও তাহলে আমরা অন্য গাইড নেবার চেষ্টা করব অল্প পয়সায়। তাও যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমরা নিজেরাই যাব গাইড ছাড়া।

মালগুনজার হঠাৎ খুব চটে গেল। গলা চড়িয়ে বলল, অন্য গাইড নিয়ে লোহারক্ষেত দিয়ে যেতে পারবেন না।

—কেন?

—আমায় আগে তার পাঠিয়েছেন। আজ আমায় না নিয়ে অন্য গাইড নিলে আমি ছেড়ে দেব না।

—তুমি তো আমাদের রেটে যাবে না বলছ। তাছাড়া মালপত্রও বইবে না কিছুই। তোমার বিছানাও মালবাহক দিয়ে বয়াবে বলছ। তোমায় নিয়ে আমাদের কি লাভ হবে?

—সুন্দরডুঙ্গা যেতে হলে আমায় নিয়ে যেতে হবে। অন্য গাইড নেওয়া চলবে না।

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। এমন বেয়াড়া লোক তো দেখিনি? বললাম, তোমায় নেব না, যাও। আমি অন্য গাইড নিয়েই যাব তোমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে। দেখা যাক, তুমি কি করতে পার। দরকার হলে তোমায় ফাটকে পুরেই এগবো।

মালগুনজার আমার চেয়েও তেতে আগুন। মাথা থেকে পাগড়ি খুলে নিয়ে বেশ ক'বার ঝাড়ল, তারপর মাথায় জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে বলল, ঠীক হ্যায়, দেখা যায়গা। ম্যায় ভি মালগুনজার হুঁ।

দোতলার কাঠের মেঝেয় ভারী বুট সুদ্ধ দুমদাম পা ফেলে মালগুনজার চলে গেল। একরাশ অশান্তি আর ভাবনার কুয়াশায় আচ্ছন্ন হলাম আমি।

স্থানীয় এক পোর্টার মেট সাবধান করল আমায়। বলল, মালগুনজার লোকটি মোটেই সুবিধের নয়। ভীষণ একগুঁয়ে আর মাথা গরম। ওর সঙ্গে বিবাদ করে সুন্দরডুঙ্গা অঞ্চলে যাওয়া খুবই মুশকিল। মাঝ পথে পোর্টারদের বিগড়ে দিতে পারে।

—কি ভাবে?

—মালগুনজারদের সবাই খুবই ভয় করে। একদিন ওরা দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা ছিল কিনা।

মেটের কাছে মালগুনজারের যে কাহিনী শুনলাম তা যেমনই

ভয়াবহ তেমনই মর্মস্পর্শী।

…মালগুনজার অর্থে খাজনা আদায়কারী। এক একটি গ্রামের যাবতীয় সরকারী খাজনা আদায় করার দায়িত্ব থাকত এক এক জন প্রভাবশালা ব্যক্তির ওপর। বৃটিশ শাসনে মালগুনজার পদের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় দুর্গম হিমালয়ে সরকারী ট্যাক্স কালেক্টর রাখা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। অথচ রাজস্ব আদায় না করতে পারলে সে অঞ্চলে বৃটিশ শাসন থাকে না। তাই মাঝে মাঝে সরকারী সৈন্যদল অভিযান চালাত এক একটা অঞ্চলে। অভিযানের সময় সে অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মালগুনজারের পদে বসিয়ে নিয়মিত খাজনা আদায় করা হত। অবাধ্য মালগুনজারদের বিরুদ্ধে কঠোর সাজার ব্যবস্থাও ছিল।

মালগুনজাররা গ্রামের প্রতিটি পরিবার থেকে সরকারী খাজনা বাবদ সমান মূল্যের ফসল আদায় করে তা সরকারী গুদামে জমা করে দিত। কালে দিনে বৃটিশ শাসনের প্রচ্ছন্ন অনুপ্রেরণায় মালগুনজাররা বকেয়া খাজনা আদায় করার জন্য সীমাহীন অত্যাচার করত গরীব গ্রামবাসীদের ওপর। সরকারী আইনে অজন্মার বছর খাজনা রেহাই-এর বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু মালগুনজারদের নিজস্ব আইনে রেহাই বলে কোনো শব্দ ছিল না। তারা খাজনা আদায় করতে না পারলে গ্রামবাসীদের ধরে আনত। দিনের পর দিন চলত অত্যাচার। তার পর ঘর-বাড়ি জমি-জমা সব লিখিয়ে নিয়ে দাস-এ পরিণত করত তাদের। যারা অত্যাচারের প্রতিবাদ করত, তাদের ঘরবাড়ি আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। মারের চোটে কারো কারো মৃত্যুও হত। মালগুনজারদের বিচারের পর আর কোনো বিচারালয় ছিল না। সাধারণ মানুষ কোর্ট-কাছারী কোথায় তাই জানত না। অসহায় মানুষগুলো তখন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়ে নীরবে অভিযোগ পেশ করে নরক যন্ত্রণা ভোগ করত।

সব মালগুনজার যে খারাপ ছিল তা নয়। এদের মধ্যেও হৃদয়-

বান পরোপকারী মানুষ ছিল। এরা অনেক সময় সরকারের সঙ্গে লড়াই করে গ্রামবাসীদের খাজনা মকুব করাতো। পথঘাট সেতু বানাতো খাজনার টাকায়।

বৃটিশ শাসনের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মালগুনজার পদ উঠে গেছে। সেখানে এসেছে তহসিলদার।

মালগুনজারদের রাজত্ব গেলেও পুরনো দিনের অভ্যাস আর স্বভাব রয়ে গেছে। তা ছাড়া অভাব অনটনে ওরা গ্রামবাসীদের টাকা ধার দিয়ে মোটা সুদ আদায় করে। এ-কারণেই গ্রামের দরিদ্র মানুষ মালগুনজারদের সমীহ করে চলে।

মালগুনজারকে বিদেয় দিয়ে নতুন গাইড আর মালবাহক যোগাড় করতে কালঘাম ছুটে গেছে।

নতুন গাইড পেয়েছি যাকে, সে এই লোহারক্ষেতেরই সম্পন্ন মানুষ। যেমন আছে ওর অভিজ্ঞতা তেমনই নির্লোভ। ওর মালবাহকদেরও রেট কম। কিন্তু নতুন গাইড মালগুনজারের ব্যাপারে দেখলাম চিন্তিত। অবশ্য আমাদের সঙ্গে এসেছে আর এক গাইড, লক্ষ্মণ সিং। ওর সঙ্গে লোহারক্ষেতের বহু মানুষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বিপদ হলেও সামাল দেবে এমন কথা আছে।

নতুন গাইড পান সিংএর সঙ্গে মালগুনজারের সম্পর্ক ভাল। একই গ্রামের বাসিন্দা ওরা। নিজের আপন মানুষের সঙ্গে বিবাদ করে আমাদের সঙ্গে প্রথমে যেতে চায়নি। লক্ষ্মণ সিং এবং ভারারি বাজারের অন্যান্যরা ওকে বুঝিয়েছে ব্যাপারটা। পরদেশী মানুষের কাছে ওদের দেশের ওদের জাতের বদনাম হবে এ-কারণেই পান সিং রাজী হয়েছে।

পান সিংকে গররাজী দেখে বলেছিলাম, তোমার অসুবিধে হলে যেওনা আমাদের সঙ্গে। লক্ষ্মণ সিং তো যাচ্ছে তাতেই হয়ে যাবে।

পান সিং জবাবে বলেছিল, মালগুনজার মানুষটা খারাপ নয় সাব। মাঝে মাঝে নিজের গোঁ রাখার জন্য অমন করে। একবার চটলে ওকে

সামলান খুবই মুশকিল। আগের এক দলের সঙ্গে ঠিক এই ব্যবহার করেছিল প্রথমে। পরে অভিযান শেষ হতে নিজের থেকে রেট কমিয়ে দিয়েছে। সেবারও আমায় সামাল দিতে হয়েছিল সাব।

লোহারক্ষেত পর্যন্ত নির্ভাবনায় এসেছি। পথে কোনো বাধা পাইনি। কিন্তু এখনও লোহারক্ষেতের বাধা পার হয়নি। তাই ভাবনা আমার মন জুড়ে।

ডাকবাংলোয় বসে আছি। বাইরে দুর্যোগ চলেছে। জল আর ঝড় চলেছে সেই বিকেল থেকে। এর মধ্যেই ডাক্তারকে মরণাপন্ন রোগী দেখতে যেতে হয়েছে বাইরে। আকাশের দুর্যোগ আর মাল-গুনজারের শাসানীর কথা মনে পড়ায় সন্ত্রস্ত হলাম ডাক্তারের জন্য।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে ডাক্তার ফিরল রোগী দেখে। মেয়েটি আসেনি। ডাক্তার অন্য দুজন লোকের সঙ্গে ফিরেছে। মেয়েটি আসতে চেয়েছিল, ডাক্তারই তাকে মানা করেছে।

—কেমন দেখলে ডাক্তার? আশা আছে কিছু?

ডাক্তার উত্তর দিল না। ওষুধের বাক্স খুলে কি-সব ওষুধ যেন বার করে দিল লোক দুটোর হাতে। কখন কেমন খেতে হবে তাও বলে দিল। লোক দুটো মস্ত সেলাম ঠুকে ওষুধ নিয়ে চলে গেল।

ডাক্তার ফিরতে রাতের শেষ রাউণ্ড কফি এসে গেল। পান সিং মগে ভরে গরম কফি এগিয়ে দিল ডাক্তারের হাতে।

কফির মগে চুমুক দিয়ে আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে অমিয় বলল রোগীর কথা।···

রোগীর বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের যুবক। কাজ করে সৈন্য বিভাগের মেডিকেল ইউনিটে। দু'মাসের ছুটি কাটাতে এসেছিল গ্রামে। এ সময়টা চাষবাস হয়, তাই সব ছেলেমেয়েই জমির কাজে নেমে পড়ে। ছেলেটিও কাজ করছিল রোদ বৃষ্টিতে। প্রথমে সামান্য জ্বর আর সর্দি কাশি হয়। তেমন গ্রাহ্য করেনি। পাহাড়ী মানুষ সামান্য রোগ গ্রাহ্য করে না। রোগ বাড়ার মুখে নিজেই নিজের দাওয়াই দিয়েছে।

তারপর রোগ যতই বাড়তে থাকে নিজের দাওয়াই ততো বেশি করে খেতে থাকে। মেডিকেল ইউনিটে কাজ করে বলে ওর ধারণা হয়েছিল ঠিক ওষুধই যাচ্ছে। শেষে হিতে বিপরীত। রোগ জটিল হয়ে গেল। নিউমোনিয়া। বুকে চাপা সর্দি আর জ্বর। পেচ্ছাব-পায়খানা বন্ধ হয়ে আছে সকাল থেকে।

—বাঁচবে তো? জিজ্ঞাসা করলাম।

—বলা মুশকিল। তবে ওষুধ ধরলে কি হয় বলা যায় না। ওর কাছে দিন সাতেক থাকতে পারলে হয়তো বাঁচানো যেত।

সকালে উঠেই যাত্রার আয়োজন করলাম। আজকের পথ চড়াই আর চড়াই। যেতে হবে আট হাজার ফুট উঁচু ঢাকুরিতে।

লোহারক্ষেত ছেড়ে বেরুতে বেশ দেরি হয়ে গেল। গতকাল রাতে মালবাহকরা যে যার রাত কাটাতে গিয়েছিল তাই ফিরতে অনেক দেরি হল ওদের। মাসখানেক ওরা থাকবে ঘরের বাইরে। আত্মীয় পরিজন থেকে অনেক দূরে সুন্দরডুঙ্গার গহন অন্দরে।

ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে গ্রামটাকে বাঁয়ে রেখে চড়াই পথে উঠছি। সরকারী পথ। চলার অসুবিধা নেই। কিন্তু রোদ ওঠার জন্য আর উত্তুঙ্গ চড়াই বলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছি।

গ্রামের সীমানা শেষ হবার মুখে অনেক গ্রামবাসী জড়ো হয়ে আমাদের বিদায় জানাতে এসেছে। এসেছে মালবাহকদের বউ-ছেলে-মা। এনেছে তারা নানা খাবার ও মিষ্টান্ন। ওদের সঙ্গে আমরাও ভাগ পেলাম। সবার শেষে গত রাত্রের সেই মেয়েটি এল। ডাক্তারকে বলল, ওর স্বামী এখন কিছুটা সুস্থ। রাতে পায়খানা পেচ্ছাব হয়ে গেছে। তবে চোখ চাইছে না বা কথাও বলছে না।

রোগীর রিপোর্ট শুনে ডাক্তারের মুখ উজ্জ্বল। ব্যাগ থেকে কটা ট্যাবলেট বার করে মেয়েটিকে দিল। আমার দিকে ফিরে বলল, হয়তো এ-যাত্রায় বেঁচে গেল।

গ্রামবাসীদের কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলেছি। মনের কানায় কানায় ওদের উষ্ণ আতিথ্য ভরে আছে।

চলমান স্রোত হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আমাকেও দাঁড়াতে হল। ওপরের বাঁক থেকে একে একে সবাই মালপিঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবার দৃষ্টি একবার সামনে, আবার পিছনে। সন্ত্রস্ত ভাব। ব্যাপার কি ?

এগিয়ে গিয়ে দেখি বাঁকের মুখে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে কঠিন মুখে মালগুনজার। দূর থেকেও ওর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলা লাল চোখ দুটো যেন দেখতে পাচ্ছি।

আজ ভুলেই গেছলাম ওর কথা। মনে পড়ছে ভারারির সেই দিনটার কথা—আমায় না নিয়ে তোমরা ও-পথে অন্য গাইড নিয়ে যেতে পারবে না। ওকে শাসাতে তার জবাবে বলেছিল –দেখা যাবে কি করে তোমরা লোহারক্ষেত পার হও।

সে দিনের সেই 'দেখা জায়গা' পোজ নিয়ে দাঁড়িয়েছে সামনে। আমারও মাথার মধ্যে খুন চাপছে। মনে মনে স্থির করলাম ইতি-কর্তব্য। দরকার হয় এই আইস এ্যাক্স দিয়ে মাথা ফুটো করে এগিয়ে যাব। রক্তারক্তি হয় হোক। এত কষ্টের অভিযান একটা শয়তান লোকের জন্য আটকা পড়বে ? ফিরে যাব পাহাড় না দেখেই ? হতে পারে না।

শক্ত হাতে আইস এ্যাক্স নিয়ে বাঁকের সামনে এসে দাঁড়ালাম মালগুনজারের মুখোমুখি। কঠিন সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাও ?

মালগুনজারের মুখের রেখা পড়তে পারছি। মুখটা থমথমে। আসন্ন কোনো দুর্যোগের ছায়া সে মুখে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক লাল। একটা কিছু করে না বসে। সাবধানে উচিত দূরত্ব থেকে হাতের অস্ত্রটি বাগিয়ে নিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, এখানে কি মনে করে এসেছ ?

মাথার ওপর আকাশটা ভেঙ্গে পড়লেও বুঝি অতটা ঝাঁকুনী খেতাম না যতটা খেলাম ওর জবাব শুনে।

—মাফি মাংনে আয়া সাব।

নরম না হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, কিউ ?

হঠাৎ পথের ওপর নতজানু হয়ে বসে ক্ষমা চাইল মালগুনজার। আমি বিমূঢ়।

অনেক বুঝিয়ে ওকে তুললাম। এককালের দোর্দণ্ড-প্রতাপ প্রৌঢ় মানুষটি নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইছে এ দৃশ্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। অস্বস্তিতে মন ভরে গেল।

ধরা গলায় মালগুনজার বলল, আপনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, আমায় মাফ করুন সাব।

মালগুনজারকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম মাফ করার কি আছে ? তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ এইতো ভাল। আমরা সমতলের মানুষ, পাহাড়ে তোমাদের সহযোগিতা না পেলে চলবে কি করে আমাদের।

আমার বিস্ময়ের তখন আরো বাকি ছিল। মালগুনজারের কাছে শুনলাম গতকাল যে ছেলেটিকে ডাক্তার ঝড় জলের মধ্যে গিয়ে দেখে ওষুধ দিয়ে এসেছে এবং আজকে যে আগের চেয়ে ভাল আছে সে ওরই একমাত্র ছেলে। ডাক্তার যখন যায় তখন ও বাড়িতেই ছিল, তবে সামনে আসেনি। ভেবেছিল আজ সকালেই দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেবে। গতকাল পারেনি ওর আত্মসম্মানের জন্য। গাঁয়ের অত লোকের সামনে ক্ষমা চাইতে ওর বিগত যৌবনের পৌরুষে বড় লাগছিল। আজও মালগুনজার গ্রামের সম্মানীয় ব্যক্তি। সেইজন্য আজ নির্জনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ক্ষমা চাওয়ার পর ওর বুকের আগুন নিভে গেছে।

আমি আশ্বাসের সুরে বললাম, ভেব না মালগুনজারজী, তোমার ছেলে নিশ্চয়ই রেগে উঠবে।

এই মুহূর্তে আবার চোখের সামনে একটা হাসি হাসি মুখ ভেসে উঠছে। সে মুখ মিঃ পাণ্ডের। যিনি আমায় বলেছিলেন হিমালয়ে এসে যদি এখানকার মানুষগুলোকে না দেখ, না চেনো, তাহলে তোমার হিমালয় ভ্রমণ ব্যর্থ।

যে মাল্গগুনজারকে আমার হিমালয়ের সংগ্রহ থেকে বাদ দিয়েছিলাম সেটাই যেন আসল মণি যা আমি চিনতে পারিনি। এ মুখে সে দিনের দেখা ক্রুরতা নেই—নেই এতটুকু মালিন্যের ছাপ। এ মুখ খাঁটি হিমালয়ের মানুষের!

চাচী। অতি সাধারণ একটি পার্বত্য নারী। এতই সাধারণ যা হাজারের ভীড়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। চাচীকে পেয়েছিলাম রূপকুণ্ডের পথে ওয়ান গ্রামে।

ছয়জন সদস্যের একটি ছোট অভিযাত্রী দল নিয়ে ১৯৬৪ সালের মে মাসে গাড়োয়াল হিমালয়ের রহস্যময় রূপকুণ্ড ও নন্দাতীর্থ হোমকুণ্ডের পথে গেছলাম। গোয়ালদাম থেকে বগড়িগড় পর্যন্ত পথ বেশ ভালই। তার পরেই পথ কঠিন। বগড়িগড় থেকে বেরুতে একটু বেলা হয়ে গেছল। মালবাহী কুলিদের কাছে জেনেছি পথ মাত্র সাত আট মাইল। সুতরাং দেরি করে বেরলেও ভেবেছিলাম দ্বিপ্রাহরিক আহারের আগেই পৌছে যাব ওয়ান গ্রামে। সামান্য কটা বিস্কুট আর চা খেয়ে বেরিয়েছিলাম। বগড়িগড় থেকে মান্দোলী গ্রাম হয়ে লোহাজং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে উৎরাই। উৎরাই শেষে পথ একটানা চড়াই আর উৎরাইতে ভরা।

হাঁটছি আর হাঁটছি। পিঠের ওপর ভারী রুকস্যাক, অনেক মালপত্র। চড়াই উৎরাই অতিক্রম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বেলা বাড়ছে। মাথার ওপর সূর্য স্থির। গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। পিপাসা বাড়ছে। পথটা অদ্ভুত, কোথাও এতটুকু জল নেই। মে মাস, বৃষ্টি নেই তাই বরফ গলা শুরু হয়নি। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ঝরনা কিন্তু সবই শুকনো। কোথাও জলের কোনো চিহ্ন

নেই। বড় বড় ঝরনাগুলো শুকিয়ে কাঠ। পাথর বেরিয়ে আছে। সমস্ত প্রকৃতিকে বড় রিক্ত বলে মনে হচ্ছে যেন।

একে তৃষ্ণা তার ওপর ক্ষিদে, শরীর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ছে। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলছি। সকালে ছয়জন বন্ধু একসঙ্গে হাঁটছিলাম। এখন ছড়িয়ে পড়েছি আগে পিছে। দুটি বন্ধু এগিয়ে গেছে, পেছনে আরো তিন বন্ধু। মাঝখানে চলেছি আমি। দূরে কোয়েল গঙ্গার কুলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সে নিচে। অত নিচে নেমে জল নিয়ে এসে পান করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। সামনে এগিয়ে চলা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই।

রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে অবসন্ন পা দুটো যখন চলার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছে তখন রডোডেনড্রন ঝোপের আড়াল থেকে যেন দেখতে পেলাম একটা পাহাড়ী গ্রামের ছবি। একি সত্যি, না মনের ভ্রম! ঝোপটা পার হয়ে স্পষ্ট দেখলাম একটা গ্রাম। তবে অনেক দূরে। হোক দূরে, তবু তো এতক্ষণে আশার আলো দেখতে পেলাম। আরো একটু এগিয়ে নজরে পড়ল একটা রূপালী ধারা। তির তির করে বয়ে চলছে শীর্ণ একটা পাহাড়ী নদী। নাম তার যাতুরপানী। তৃষ্ণা বেড়ে গেল প্রচণ্ডভাবে। ছুটলাম নদীর দিকে।

অঞ্জলি ভরে জল খেলাম। শীতল জল। সারা দেহ যেন জুড়িয়ে গেল। বন্ধু দুজন আমাদের অপেক্ষায় বসেছিল। যাতুরপানী নদীর তীরে। আমাকে আসতে দেখে ওরা চলে গেল ওয়ান ডাকবাংলোয়। গ্রাম আর ডাকবাংলো এখান থেকে প্রায় সমান দূরত্বে। গ্রামে থাকার চেয়ে ডাকবাংলোয় থাকার আরাম বেশি। তাছাড়া, ডাকবাংলোর পাশ দিয়েই রূপকুণ্ডের পথ শুরু হয়েছে। এ কারণে, ডাকবাংলোয় থাকাই স্থির হয়েছে আগে।

শীতল জলে তৃষ্ণা মিটল কিন্তু পেটের ক্ষিদে যেটা এতক্ষণ প্রায় চাপা পড়েছিল, তা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। নদীর ওপারে পথ। খাড়া ওপরে উঠে গেছে। তাড়াতাড়ি ডাকবাংলোয় পৌছবার জন্য উঠে পড়লাম।

চড়াই আর চড়াই। বিশ্রী লাগছে। আর ভাল লাগছে না এই ক্লান্তিকর চড়াই ভাঙ্গতে। কিন্তু না উঠে উপায়ও নেই। হিমালয়ের পথই যে এই। এখানে অভিমান করব কার ওপর। ভীষণ ক্ষিদে পাচ্ছে। পিপাসাও লাগছে আবার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ওপর দিকে তাকাচ্ছি, পথ আর কতটা বাকি! ঘন অরণ্য ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না। পায়ের জোর কমে আসছে। পিঠের বোঝাটা বড় বেশি অস্বস্তিকর ঠেকছে। ওটা না নিতে হলে বোধহয় এত কষ্ট হত না। দু'পা ফেলছি আর বিশ্রাম নিচ্ছি। বিশ্রাম নিচ্ছি আর এগতে চেষ্টা করছি। না, আর পারছি না। বিশ্রাম চাই। অনন্ত বিশ্রাম!

পথের ধারে বড় একটা পাইন গাছের মোটা গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসলাম। গাছের গায়ে মাথা এলিয়ে দিয়ে কখন চোখ বুজেছি খেয়াল নেই। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় কার আসার শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল।

এক প্রৌঢ়া আর এক তরুণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখে মুখে তাদের জিজ্ঞাসা। পাহাড়ী ভাষায় কী যেন জিজ্ঞাসা করল প্রৌঢ়া। বুঝতে পারলাম না। মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হিন্দীতে বললাম, বহুত ভুখ লাগা হ্যয়।

তরুণীটি হেসে উঠল খিলখিল করে। প্রৌঢ়া ধমক দিল তাকে। হাত পা নেড়ে আবার কি যেন বলল। বুঝলাম না।

ইশারার ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করলাম—ম্যায় ভুখা হুঁ। পেটে হাত দিয়ে দেখালাম, একদম খালি।

যুবতী মেয়েটি আবার হাসির ফোয়ারা ছোটাল। প্রৌঢ়াও এবার সে হাসিতে যোগ দিয়ে অজানা ভাষায় কিছু বোঝাতে চেষ্টা করে শেষে তড়িৎগতিতে সামনের পথে চলে গেল। যুবতীটি আমার দিকে একবার তাকিয়ে বিচিত্র এক হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে প্রৌঢ়াকে অনুসরণ করল। পথটা ওয়ান গ্রামের দিকে গেছে।

ওদের অপসৃয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে ভাবলাম, ঠিক মতো

বোঝাতে পারলে হয়তো কিছু জুটত ভাগ্যে। অবশ্য অত দূরের গ্রামে গিয়ে খাবার নিয়ে আসতে আসতে আমার চৈতন্য থাকলে তবেই। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে। রুকস্যাক মাথায় দিয়ে অবচেতনায় গভীরে ডুব দিলাম।

কে যেন ঠেলছে আমায়। চোখ মেলে দেখি সেই যুবতী মেয়েটি আমায় ধাক্কা দিচ্ছে। প্রৌঢ়া দুটো তিজেল হাঁড়িতে কি যেন নিয়ে এসে বসেছে পাশে। অতি কষ্টে উঠে বসলাম। দেখলাম একটা কালো হাঁড়িতে ততোধিক কালো কালো ভাত আর অপর হাঁড়িতে ধবধবে সাদা দই। আর একটা মগে ঘি। কলাইকরা চটাওঠা থালা নিয়ে এসেছে একটা। থালায় ভাত দই আর ঘি তুলে আমার সামনে বসিয়ে দিয়ে ইশারায় খেতে বলল।

ভীষণ ক্ষিদের মাথায় সব ভুলে গেছলাম। কোনো দিকে না তাকিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগলাম। এক সময় ছোট হাঁড়িটা শূন্য হয়ে গেল। তাকালাম প্রৌঢ়ার মুখের দিকে। প্রৌঢ়ার চোখে মুখে পরম তৃপ্তির ছবি যেন দেখলাম। ক্ষুধার্ত সন্তানকে খাইয়ে মায়ের যে আনন্দ আর তৃপ্তির সেই অনুভূতির স্পষ্ট ছোঁয়া পেলাম যেন।

ওয়ান গ্রামের সরকারী ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে আছি সেকেলে একটা ইজি চেয়ারে। সামনে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ। বড় বড় ঝাউ, সিলভার পাইন, বার্চ, সিডার, দেওদার আর রডোডেনড্রনের নিবিড় অরণ্যলোক। অরণ্যলোকের ছায়ায় বাংলোর চৌহদ্দি ঘিরে রক্ত গোলাপের বাহার। সামনের লনের মাঝখানে সূর্যমুখীর কেয়ারী।

বাংলোর সীমানা যেখানে শেষ সেখান থেকে পাহাড় খাড়াই নেমে গেছে নিচে যাতুরপানী নদীর পাড়ে। নদীর ওপারে দিগন্ত বিস্তৃত গিরিশিরা। সবুজ বাদামী দিনান্তের শেষ আলোটুকু শুষে নিয়ে কালচে হয়ে গেছে।

সূর্য অস্ত গেল।

পথপ্রদর্শক আর কুলির দল খানিক আগেই ফিরে গেছে গ্রামে। আমাদের এখানে থাকার সুবন্দোবস্ত করে তবে গেছে। আসবে আগামী কাল ভোরে।

কালই অভিযানের প্রকৃত কাজ শুরু হবে। কারণ পথে আর মনুষ্যবসতি পাব না কোথাও। খাবার-দাবার সাজ-সরঞ্জাম সব কিছুই এখান থেকে গুছিয়ে নিয়ে যাত্রা করব হোমকুণ্ডের পথে।

পথের কথা ভাবতে বসে প্রৌঢ়ার হাসি মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে।

প্রৌঢ়া আমাদের পথ প্রদর্শক হুকুম সিংএর চাচী। পরিচয়টা হুকুম সিং নিজেই দিয়েছিল।

ডাকবাংলোয় পৌঁছনর প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে হুকুম সিং আসে দেখা করতে।

প্রাথমিক আলাপচারির পরই বলে, চাচীর কাছে আপনাদের আসার খবর পেয়ে ছুটে এলাম।

—কে চাচী ?

—যার সঙ্গে আপনার পথে দেখা হয়।

—সেই প্রৌঢ়া তোমার নিজের চাচী ?

—জী সাহাব। খানিক ইতস্তত করে হুকুম সিং বলল, চাচী দুঃখ করছিল, ছেলে আমায় চারটি ভাত দেওয়ার জন্য বকশিস দিতে চাইছিল। সত্যি সাহাব ?

লজ্জায় পড়লাম। মনে পড়ছে পাঁচটা টাকা দিয়েছিলাম চাচীর হাতে মিষ্টি খাবার জন্য। চাচী প্রথমটায় অবাক হয়ে একবার টাকা আর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে কি বলে টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে চলে গেছল গ্রামের দিকে।

বললাম, বুড়ো মানুষ মিষ্টি খেতে দিয়েছিলাম। বকশিস নয়। আমার ওপর রাগ করে শেষে চলে গেল। তোমাদের দেহাতি ভাষা

চাচীকে আমার কথা বলো ভাই।

এবার হুকুম সিং বিব্রত বোধ করল। ঘনঘন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ও কিছু নয় কিছু নয়, সাব। আমি চাচীকে বুঝিয়ে বলব। আপনি কিছু মনে করবেন না।

তারপর হুকুমের কাছে চাচীর অনেক কথা শুনেছি।

…অল্প বয়েসে একমাত্র সন্তান আলম সিংকে নিয়ে চাচী বিধবা হয়। স্বামী ছাড়া সে বংশে আর কোনো পুরুষ ছিল না। থাকলে হয়তো মরদ নিতো চাচী। নিজেদের জাতের মরদ অনেক ছিল, তাদের কাউকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু রাজী হয়নি চাচী নিজে, পাছে আলমের দেখাশোনার কোনো অসুবিধে হয়। নিজের সন্তান ছাড়া অপরের সন্তানকে কে আর আদর করবে, এই ভয় ছিল চাচীর।

নিজের সামান্য জমিতে উদয়াস্ত খেটে যা ফলত তা দিয়ে কোনো রকমে মানুষ করে তোলে আলমকে। কিছু লেখাপড়াও শিখিয়েছিল।

ওদের গ্রামের প্রতিটি ঘরের দু' একজন সৈন্য বিভাগে কাজ করে। সেপাইএর কাজ করাটা বংশ মর্যাদায় দাঁড়িয়ে গেছে ওদের সমাজে। আলমও তাই বড় হয়ে সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

মায়ের সামান্য আপত্তি থাকলেও ছেলেকে রুখে রাখেনি। কোনো পাহাড়ী মা তা করে না। ছেলে জওয়ান মরদ হোক এটা সবাই চায়।

সৈন্যদলে যোগ দেবার আগে আলমের বিয়ে দিয়ে দিল চাচী। টুকটুকে সুন্দর একটা বউ ঘরে তোলার ক'মাস বাদেই আলম সৈন্য-দলে চাকরি-পেয়ে চলে গেল।

ট্রেনিং শেষ করে একবার গ্রামে এসেছিল। দু'মাসের একটানা ছুটি কাটিয়ে ফিরে গিয়েছিল ইউনিটে। তারপরই বাষট্টি সালের লড়াই। সে লড়াইএ আলম হিমালয়ের আর এক প্রান্তের সীমান্তে মাটি নিলো। আর ফিরে এলো না।

খবর এসেছিল গ্রামে। এসেছিল টেলিগ্রাম আর অর্থ সাহায্য। টাকাটা চাচীকে দিয়েছিল বটে তবে টেলিগ্রামের খবরটা ভাঙেনি। আজও চাচী জানে ছেলে তার হিমালয়ের পথে পথে রাইফেল কাঁধে নিয়ে কর্তব্য করে চলেছে। পাথরে বরফে ঘুরে ডিউটি দিচ্ছে। সময় মতো খাবার সুযোগ পায়না। অনেক সময় অভুক্ত থাকে।

গাড়োয়ালী ছেলে লড়াই করবে না করবে কে? তবে মায়ের প্রাণ ছেলের কথা ভেবে মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে পড়ে। ইদানিং মাথার সামান্য গোলমাল দেখা দিয়েছে। আলমের বয়েসী ছেলে দেখলে চাচীর মাতৃত্ব সচেতন হয়ে ওঠে।

আমায় পথের ধারে গাছতলায় ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে চাচীর নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে। মুখ দেখেই বুঝেছিল আমি ক্ষুধার্ত। সেইজন্য অতদূরের গ্রাম থেকেও ভাত দই ঘি বয়ে এনে আমায় খাইয়েছে।

আর খাওয়ার পর খুশি হয়ে পাঁচটা টাকা মিষ্টি খেতে দেওয়াতে চাচীর মাতৃহৃদয় অভিমানে আহত হয়েছে।

হিমালয়ের গহনে বসে আজ শত সহস্র মাইল দূরে থাকা মায়ের মুখ আমার মনে পড়ছে। জন্মের পর জ্ঞান উন্মেষের মুহূর্ত থেকে মায়ের যে স্নেহ পেয়েছি তারই আর একখানি হাতের স্নেহমাখা পরশ যে এই দূর-দুর্গম হিমালয়ের বুকে বসে পাব তা কি কল্পনা করেছি কোনো দিন?

চাচীর মুখের ভাষা বুঝিনি। আমার ভাষাও চাচীর কাছে তথৈবচ। কিন্তু হৃদয়ের ভাষা বুঝি আলাদা। এ ভাষা বোঝানোর জন্য দোভাষী লাগে না। সন্তানের বেদনার সব ভাষাই বুঝি বোঝে সব দেশের মাতৃহৃদয়।

চাচীর মুখের পাশে আর একটা উজ্জ্বল চঞ্চল বেগবতী তরুণীর চকচকে মুখ ভেসে উঠল। আমার কথা বুঝতে না পেরে যে যুবতীটি হাসির ঝরনাধারায় কল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বারবার। সেই অল্প বয়সী মেয়েটি চাচীর ছেলে আলম সিংএর বউ নয় তো…?

উকিলকে পেয়েছিলাম উত্তর গাড়োয়াল হিমালয় অভিযানের সময়। বেঁটে-খাটো বৈচিত্রহীন একটা সাধারণ পাহাড়ী মানুষ সামান্য ইংরেজী বোঝে। বাংলাও বুঝতে পারে। হিন্দী মাতৃভাষা না হলেও বলে, লেখে এবং পড়ে ভাল। এমন মানুষ একটু চালাক-চতুর হবে এটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতা উকিলের মধ্যেও ছিল।

যোশীমঠের কাছাকাছি গ্রাম রিনি। রিনির বাসিন্দা জয়সিং। আমাদের উকিল। উকিল নামটা দিয়েছিল অভিযানের এক সদস্য বন্ধু।

তিরিশটা কুলির মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম পরিচিত হই জয়সিংয়ের সঙ্গে। মালারি থেকে পদযাত্রার প্রথম রাত্রিযাপন করি শেষ—ভারতীয় গ্রাম নিতিতে। নিতির প্রাইমারী স্কুলের ঘরে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম আর অভিযান চিন্তায় যখন মগ্ন তখন কুলির দল আমাদের সামনে এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল। কিছু নিবেদন আছে বুঝলাম।

নিবেদনটি কি জানতে চাওয়ায় বৈচিত্র্যহীন মানুষটা দলের মাঝখান থেকে এগিয়ে এসে হাঁটুগেড়ে বসে বললে, কোয়ার্টার সাব, রাত কো খানা নেহি মিলেগা বোলরহা। বেগারখানা ক্যায়সে কাম করেঙ্গে সাব?

বুঝলাম আমাদের দলের কোয়ার্টার মাস্টার অর্থাৎ খাদ্যসচিব ওদের খানা দেবে না বলে দিয়েছে। অবশ্য সেই রকম নির্দেশ আছে ওর ওপর।

—তোমার নাম কি?

—জয়সিং, রিনিওয়ালা।

এ অঞ্চলের মানুষ নিজেদের নামের সঙ্গে গ্রামের পরিচয়টা দিতে অভ্যস্থ। রিনি গ্রামের কুলিদের নেতা এবং মুখপাত্র তাহলে জয়সিং। একে আয়ত্তে আনতে হবে আমাদের। কারণ, কুলিদলের মুখপাত্রকে হাত করতে পারলে মুশকিল আসান করে তারা। অনেক সময় সর্দার-দের চেয়েও এদের প্রভাব বেশি কাজ করে।

—তোমাদের তো খাবার দেবার কথা নেই বেস ক্যাম্পের আগে।

—ঠিক বাত। লেকিন সাব, খানা না দিলে কাল অত মাল নিয়ে চড়াই ভাঙব কি করে। আগে পেট, তবেই না বোঝা টানার তাকত জুটবে। জয়সিং বেশ মিষ্টি করে বলল।

—তোমরা জেনে শুনে খাবার নিয়ে আসো নি কেন? যা চুক্তি হয়েছে তাই পাবে। মূল শিবিরে গিয়ে আমরা রেশন দেব। গ্রাম থেকে কিনে নাও তোমাদের খাবার। একটু কঠিন সুরে বললাম।

সমবেত কুলিদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। নিজেদের ভাষায় অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। জয়সিং ওদের ধমক দিয়ে থামালো। আবার অনুনয়ের সুরে বলল, সাব, আজ থেকে আমরা তোমাদের সঙ্গী। ভাল মন্দ সব সময় তোমাদের পাশে পাশে থাকব। আমরা অভুক্ত থাকব আর তোমরা খাবে সেটা কি ভাল দেখাবে?

যুক্তিটা অকাট্য। কিন্তু চুক্তির খেলাপ হয় ওদের নিতিগ্রামে খাবার দিলে। আজ আমাদের কাছ থেকে আদায় করলে পরে সবায়ের কাছে আদায় করবে। অথচ খাবার না দিলে এদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাবে না।

আমায় ভাবতে দেখে জয়সিং বললো, আজ দাও, কাল চাইব না সাব।

দিতেই হল। ওদের যুক্তির কাছে চুক্তি হার মানল।

মূল শিবির থেকে জয়সিং ওরফে উকিল সূক্ষ্ম এবং নব নব উপায়ে ওদের দাবী পেশ করতে লাগল।

মূল শিবিরে একদিন সকালবেলা উকিল কোয়ার্টার মাস্টারের রসুই-তাঁবুতে গিয়ে হাজির। ওকে দেখে কোয়ার্টার মাস্টার তো ক্ষেপেই লাল। লোকটাকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না ও।

—কি চাই তোমার? এখানে এখন কেন?

—এ্যাইসা। সাহাবদের রান্নাঘর দেখতে এলাম। উকিল বিনয়ের অবতার যেন।

রান্নাঘরের কি দেখবে? চটে ওঠে কোয়ার্টার মাস্টার।

—দেখছি, কত জিনিষপত্র বাসন-কোসন তোমরা ব্যবহার কর। তোমাদের এখানে রান্না করতে হলে হাঁপিয়ে উঠব।

—যাও, আর হাঁপাতে হবে না।

—আচ্ছা সাব, তোমরা আমাদের মতো হাতে রুটি বানাও না কেন? রুটির স্বাদ হয়।

তোমাদের ঐ গদধর রুটি আমাদের গলা দিয়ে নামবে না।

--তোমাদেরগুলো খুব পাতলা। খুব নরম তাই না সাব?

— হ্যাঁ। কোয়ার্টার মাস্টার এড়াতে চায়।

—ও শেরপা ভাইয়া, একটা রুটি এদিকে দাও না। দেখি সাহেবদের রুটির স্বাদ কেমন।

কোয়ার্টার মাস্টারদের মাথায় আগুন জ্বলে কিন্তু কিছু বলতে পারে না। উকিলের স্পর্দ্ধা ক্রমেই বাড়ছে।

রুটি নিয়েই আবদার ধরল শিশিতে রাখা জেলির জন্য। কোয়ার্টার মাস্টারের রাগ চড়লেও মানুষটার উত্তাপহীন আবদারকে ঠেলতে পারল না, বরং এড়াবার জন্য খানিকটা জেলি দিয়ে বিদায় করল। খবরটা উকিল গিয়ে রটিয়ে দিল কুলি মহলে। ব্যস, মাছির মতো ছেঁকে ধরল কুলির দল। সাব, কভি নহী খায়া ও চিজ, এক ডিব্বা দে দিজিয়ে। শেষে জেলির শিশি নিয়ে তবে ছাড়ল।

যত দিন যায়, কুলিদের আবদার বাড়ে। আবদার করে দুবার। সকালে আবদারের সঙ্গে থাকে প্রত্যক্ষ দাবীর সুর। না দিলে সময় মতো ওপরের ক্যাম্পে মালপত্র পৌঁছবে না। বিকেলের আবদার সেন্টিমেণ্টাল কথা দিয়ে ভরা। খানিকটা আবেদন নিবেদন। সব দাবীর পেছনে বা সামনে উকিল আছে। সবায়ের মুখপাত্র হয়ে উকিল এগিয়ে আসে। দেখায় নিজের যেন কোনো দাবী নেই। এক-এক সময় কুলিরা অভিযোগ করে—জয়সিং নিজে পুরো ডিব্বা হজম করে দিয়েছে।

যেদিন আমাদের অভিযাত্রীরা উত্তর গাড়োয়ালের বিধান পর্বত শিখর আরোহণ করতে যাচ্ছে, সেদিন উকিল নিচের মূল শিবির থেকে

তিনজন পোর্টার নিয়ে সরাসরি দ্বিতীয় শিবিরে এসেই তৃতায় শিবিরে যেতে চাইল! ওপরের সাহেবদের মদত দিতে চায়। প্রস্তাবটা ভাল লাগল। রাজি হলাম ওদের কথায়। যেই রাজি হয়েছি অমনি আবদার করে বলল, কিছু টিনের খাবার চাই। চাইতে লাগল মাছ-মাংস-ফল। সেদিনটা কার্পণ্য করিনি। ওদের রুকস্যাক ভরে দিয়েছি টিনের খাবারে। এই প্রথম উকিলকে অবাক হতে দেখলাম। বলল, ইতনা! আপলোঁগকো তকলিফ হোগা সাব।

উকিলের পিঠ চাপড়ে বললাম, হবে না, যা আছে তাতে চলে যাবে। উকিল বোকা বোকা চাউনি মেলে মালগুলো রুকস্যাকে তুলে দ্বিগুণ উৎসাহে তিন নম্বর শিবিরের দিকে গেছল। এবং আমাদের আশ্চর্য করে দিয়ে ঐদিনই বিধান পর্বত শিখর আরোহীদের সঙ্গে তিন নম্বর থেকে দু নম্বর শিবিরে বিকালে ফিরে রাত প্রায় ৭টায় মূল শিবিরে সাফল্যের সংবাদ নিয়ে পৌঁছেছিল। একদিনে প্রায় সাড়ে ছ হাজার ফুট আরোহণ এবং অবরোহণ অবিশ্বাস্য! মূল শিবিরের উচ্চতা ১৪,৩০০ ফুট এবং তিন নম্বরের উচ্চতা ২০,০০০ ফুট।

অভিযান শেষ হয়ে গেছে। সাফল্যের জয়মাল্য নিয়ে আমরা ফিরতি পথের যাত্রী। গৌরাঙ্গ আর বিধান পর্বত শিখরে আমাদের সাফল্যের বার্তা রেখে এসেছি। খুশি খুশি মনে ঘরের দিকে ফিরে চলেছি।

একটানা পরিশ্রমে ফেরার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কাহিল দেহটা টেনে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝেই পথের ধূলায় শুয়ে পড়ছি। আমাকে ধূলায় শুতে দেখে উকিল অনুযোগ করছে। সকাল থেকে সঙ্গ ছাড়েনি। অত মাল পিঠে নিয়ে আমার অতি মন্থর গতির সঙ্গে এগুচ্ছে। ওর কষ্ট হচ্ছে দেখে অনেকবার বলেছি এগিয়ে যেতে। কিন্তু রাজি হয়নি। ভারী বোঝা নিয়েও কঠিন পথে বারে বারে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে। এক সময় ওকে ঠাট্টা করে বলেছি, উকিল তোমার দরদ দেখে আমার ভয়

হচ্ছে আবার কিছু দাবী করে না বসো। এখন আর কিছু দেবার মতো নেই কিন্তু।

উকিল আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে ওঠে সাব, আমরা হিমালকা আদমী, মন আমাদেরও আছে। আমাদেরও এতো ছোট ভেব না।

সেপুকে শরীরটা আরো ভেঙে পড়ল। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেদনা কমানোর জন্য। এমন সময় কানে এলো কুলিরা মাল বইতে চাইছে না। ডবল মজুরী চাইছে। ওদের নেতা সেই জয়সিং। ওই নাকি ক্ষেপিয়েছে কুলিদের। যন্ত্রণার মধ্যেই তাঁবু ছেড়ে কুলিদের কাছে এলাম। বোঝালাম বিপদের দিনে এভাবে কাজ করতে না চাওয়া তাদের উচিত নয়। অবশেষে রাজি হলাম ডবল মজুরী দেবার। কিন্তু ওরা চায় হাতে হাতে মজুরী দিয়ে দিই। প্রস্তাব মানতে পারলাম না। কুলিরা মালপত্র ফেলে চলে গেল নিচে।

গেল না কেবল একজন—উকিল।

—সাব মাফ করদো, ম্যায় ভুল কিয়া।

উকিলের কথায় অবাক হলাম। তবু মনের বিস্ময় গোপন করে বললাম, ওদের ডবল মজুরীর জন্য ক্ষেপিয়েছিলে? ঠিক আছে। দলের সবাই নেমে যাবে আমি থাকব এখানে। নিচ থেকে পোর্টার এনে মাল নিয়ে যাব। উকিল, তুমিও যাও। আমার কাউকে চাই না।

—নেহি সাব। আপ বেমার আদমী। এখানে থাকলে মারা পড়বেন। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি মালপত্রের। রিনির মানুষ বেইমান নয়। আমার জন্য আপনাদের তকলিফ হয়েছে। দোষ আমার—দায়টাও আমার।

এ এক অন্য মানুষ যেন দেখলাম। দাবী আদায়ের ফিকির সন্ধানী উকিল, না বিশ্বস্ত সমব্যথী বন্ধু!

উকিল সেদিন দায়িত্ব নিয়েছিল ওপরের মালপত্রের। একদিন পরে বিরাট ঝব্বু অর্থাৎ চমরীগাইয়ের মিছিল নিয়ে মালপত্র যথাযথ মালারিতে নামিয়ে এনেছিল।

মালারি থেকে বাসে যাত্রা শুরু হবে। মালপত্র গাড়িতে তোলা হয়ে গেছে। রাগ করে ফিরে আসা কুলির দল একে একে মজুরী নিয়ে মাফি মেঙ্গে বিদায় নিয়েছে। আজ আর রাগ নেই কারো। সব শেষে এলো উকিল।

আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে তার মাফি মাঙ্গার পালা। চোখ লালচে, গলার স্বর প্রায় রুদ্ধ। বললো, এই উকিল তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে সাব। উকিলের অর্থ আমি জানি। সত্যি কুলিদের হয়ে তোমাদের কাছে দাবী আদায় করতাম ওকালতি করতাম। প্রথম দিকে কিছুটা লোভ ছিল সত্যি। শেষে শুধু মজা করার জন্য অমন করতাম সাব। রুক্ষ পাহাড়ে হিমালে হাসি না থাকলে, প্রাণ না থাকলে কাজ করতে পারি না সাব। শেষের মজাটা যে এমন খারাপ হয়ে উঠবে ভাবিনি। আর মজাক করব না সাব, কখনো মজাক করব না হিমালে। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল উকিল ওরফে জয়সিং।

আমরা ওর কান্না দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়লাম।

হিমালয়ের পথে পথে বহু মানুষের, বহু হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ আমার জীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা বারে বারে নাড়া খেয়েছে। সেই দোলা দেওয়াদের একজন—উকিল জয়সিং রিনিওয়ালা।

উৎরাই পথে নেমে চলেছি। অনেক পেছনে জাতেলী গ্রাম ফেলে এসেছি। বেলাও বাড়ছে। অরণ্যরেখা সরে যাওয়ায় তির্যক রশ্মি পাথরে প্রতিফলিত হয়ে দারুণ উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

আজকের পথ দীর্ঘতম। একটানা সাত মাইলের উৎরাইয়ের পর পাঁচ মাইল চড়াই। আট হাজার ফুট থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট

উচ্চতায় নেমে আবার আট হাজার ফুট উঁচু ঢাকুরী ডাক বাংলোয় পৌছতে হবে।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে দুটি পথের সঙ্গমে পৌছলাম। এখানে আমরা দুটি দলে ভাগ হলাম। একটি দল উৎরাই পথে ঢাকুরী ডাকবাংলোয় যাবে। অপর দল যাবে আরো মাইল দেড়েক দূরে ওয়াছাম গ্রামে।

ডাক্তার অমিয় হাটিকে নিয়ে আমায় যেতে হল দ্বিতীয় পথে ওয়াছাম গ্রামে। সঙ্গে কয়েকজন মালবাহক। ওদের ঘর ওয়াছাম গ্রামে। দুটি মালবাহকের স্ত্রী অসুস্থা। ডাক্তারের কাছে ওরা আবেদন করেছে সেই অভিযানের সুরু থেকে। কথা দিয়েছিলাম ফেরার পথে নিশ্চয়ই ওদের গ্রামে যাব। সেই কথা রাখার তাগিদে চলেছি ওয়াছাম গ্রামে।

চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে ওয়াছাম গ্রামে যখন পৌছলাম তখন দেখি গ্রামের ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ি পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের আসার খবর ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে।

সরু পাথর পাতা পথটা শেষ হল একটি বড় বাড়ির সামনের পাথর দিয়ে বাঁধান চত্বরে। ঝকঝকে তকতকে অঙ্গন। বড় বড় দুটো কম্বল পাতা তার ওপর। আমাদের বসার ব্যবস্থা। গ্রামপ্রধানের বাড়ি। বৃদ্ধ গ্রামপ্রধান আমাদের আপ্যায়ন করে বসালেন। দেখলাম অনেক রোগশীর্ণ নরনারী অপেক্ষা করছে।

ডাক্তার ওদের চিকিৎসা সুরু করল।

সময় নিল অনেক। নানা জনের নানা রোগ। এক এক জনকে দেখে আর বাক্স হাতড়ে ওষুধ দেয়। রোগী দেখা যখন শেষ হল তখন বেলা পড়ে এসেছে।

মূল শিবির থেকে বিদেয় করে দেওয়া মালবাহকদের অনেকের ঘর ওয়াছাম গ্রামে। তারা এসে দেখা করল। অভিযানের অনেক খবর নিল। জনে জনে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। আপ্যায়ন করল চা আর মেঠাই দিয়ে।

হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছি। দেখছি নানা মানুষ। এদের

বেশির ভাগই দরিদ্র। অধিকাংশ দিনই এদের সামান্য আহারও জোটে না। কঠিন পাথুরে মাটিতে যে ফসল হয় তাতে অনেক ভাগ। চাষ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। তাই এদের যোয়ান ছেলেরা সৈন্যদলে চাকরী নেয়। সমর্থ দেহ। কাজ পেতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। যারা তেমন সমর্থ নয় দুর্ভাগ্য বেশি তাদেরই। অনাহারে অর্ধাহারে এদের বেশির ভাগই শীর্ণ দারুণ শীত আর বরফের নির্মম কামড়ে ওদের রক্তশূন্য দেহগুলো গরম কাপড়ের অভাবে নীল হয়ে যায়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করে এরা বেঁচে থাকার অক্লান্ত প্রয়াস করে চলেছে। এত প্রতিকূলতা আর দারিদ্র্যের মধ্যেও কিন্তু এরা সরল প্রাণবন্ত উচ্ছল। এদের আপ্যায়নে আছে হৃদয়ের উত্তাপ। ভাঙ্গা কাপ অথবা জীর্ণ কাঠের বাটিতে চা এগিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে হচ্ছে। বেলা পড়ে আসছে। বুঝতে পারছি আজ ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে। কিন্তু এই সরল মানুষগুলোর সহজ আপ্যায়ন ছেড়ে যাই কেমন করে। আর হয়তো এ অঞ্চলে কোনদিন আসতে পারব না। আমার হিমালয়ের মানুষ দেখার ঝুলি অপূর্ণ হয়ে থাকবে।

শেষ ঘরটা থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়লাম। একটু পা চালিয়ে যেতে হবে। চুয়া আর ফাফরের লাল-সবুজ ক্ষেতের মধ্যে উৎরাই পথ সোজা নেমে গেছে পিণ্ডারী নদীর তীরে। পুল পার হয়ে ওপারে ঢাকুরী ডাকবাংলোর চড়াই পথ।

থমকে দাঁড়ালাম।

—নমস্তে সাব। ভাল আছেন তো?

মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ক্ষতবিক্ষত মুখওয়ালা ছোকরা মালবাহকটা।

কি যেন নাম? মধুদা—মাধোরাম সিং। একেই মূল শিবির থেকে প্রথম দিনেই বিদেয় করেছিলাম।

—মেরা গরীবখানামে চলিয়ে সাব।

—অনেক দেরি হয়ে গেছে মাধোরাম। আবার এলে তোমার

বাড়ি আগে আসব। স্তোক দিয়ে সরে পড়তে চাইলাম।

—নহী সাহাব। মেহমান ঘরে না এলে আমরা কষ্ট পাই। একবার অন্ততঃ চলুন। মাধোরাম সিং অনুনয়ের সুরে বলল।

লোকটিকে যদিও প্রথম দিন থেকেই কেন যেন সহ্য করতে পারি না। তবু ওর অনুরোধ ফেলতে কেমন যেন লাগল। বললাম, কত দূরে তোমার ঘর?

—কাছেই।

চুঁয়া-ফাফরের রঙিন ক্ষেতটা পার হয়েই পথের বাঁদিকে মাধোরামের ঘর। সামনে সামান্য একফালি বাগান। ফুল আর আনাজের চাষ করেছে তাতে।

ঘরের সামনে আসতে দেখলাম দরজা ধরে একটি অপরূপ সুন্দরী তরুণী বধূ দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখে মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা জানাল।

এদিকের সব বাড়িই দোতলা। নিচে গরু-মোষ-ভেড়া থাকে। ওপরে ঘরের মালিক। ছোট ছোট জানালা আর দরজা। ঘরগুলো গাড়োয়াল হিমালয়ের পাহাড়ী মানুষদের মতো মাথা নিচুওলা নয়। এই কুমায়ুনীদের ঘরগুলো বেশ উঁচু।

ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাবার চুল্লির ধারে বড় একটা কাঠের পিঁড়ে। ওটি মেহমানের জন্য। আমাকেও বসতে হল সেই উঁচু পিঁড়ের ওপর। মেয়েটি কাঠের পাত্রে চা নিয়ে এল। কলাই-ওঠা একটা থালায় ক্ষীরের কতগুলো লাড্ডু দিয়ে বসল মাধোরামের পাশে।

বুঝলাম মাধোরামের স্ত্রী।

—তোমার ছেলেমেয়েদের দেখছি না তো?

মাধোরাম লাজুক হেসে বলল, এখনও আসে নি।

—সেকি কথা? আনা চাইয়ে।

—ক্যায়া বিলায়েঙ্গে সাব?

—সবাই যেভাবে খাওয়াচ্ছে, তেমন করে খাওয়াবে।

—আমাদের তো জমি নেই সাব। অপরের জমিতে দু'জনে কাজ

করে যা পাই তাতে সারা বছর চলে না। অনেক দিন বাদে আপনাদের মতো দল এদিকে এল বলে দু-চারটে টাকা আয় হল।

—পিণ্ডারী হিমবাহে তো অনেকেই যায় আজকাল। ওদিকে গেলে তো পার, আয় হবে।

—ছাড়তে চায় না। মাধোরাম বউটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল।

হাসলাম। এমন ডাকাতে মানুষকে ওই ভাল মানুষ বউটা আটকে রাখে। আসলে নিজেই হয়তো যেতে চায় না। এমন বউ ঘরে ফেলে কেই বা পাহাড়ে পর্বতে অভিযাত্রীদের সঙ্গে ঘুরতে চায়?

দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে, খানিক বাদেই সন্ধ্যার অন্ধকার নামবে। সন্ধ্যার আগেই পিণ্ডারী নদী পার হয়ে ঢাকুরীর চড়াই পথ ধরতে হবে। অন্ধকার হয়ে গেলে পথ খুঁজে পাব না। পথ হারালে সারা রাত কাটাতে হবে বন-জঙ্গলে খোলা আকাশের নিচে। ওদিকের পথটাও নাকি ভাল নয়। রাতে ভাল্লুক আর নেকড়ে জাতের বাঘ বেরয় জঙ্গলে।

মাধোরাম আর ওর বউয়ের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি পথে। লম্বা পায়ে ঢালু পথে নামছি। পথের ধারের জমিতে কাজ সেরে চাষীর দল ঘরে ফিরছে। নিচে পিণ্ডারী নদীর উদ্দাম নৃত্যের প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসছে।

...মধুদা ওরফে মাধোরাম সিংকে প্রথম দেখি কাপকোটে। সুন্দর-ডুঙ্গা অভিযানের প্রাক্‌কালে আমি আর ডাঃ অমিয় হাটি কাপকোটে চারটি দিন কাটিয়েছি মালবাহক সংগ্রহের কাজে। দলের অন্যান্য সদস্যরা তখনো এসে পৌঁছয়নি কাপকোটে।

প্রথম দিন স্নান করতে গিয়ে সরযূ নদীতে চশমা হারিয়ে এসে-ছিলাম। চশমাটা ফিরে পাবার আশা যখন ছেড়ে দিয়েছি ঠিক তখনই মাধোরাম আমায় ওটি দিয়ে যায়। নদীর পাড় থেকে পেয়ে-ছিল কুড়িয়ে।

প্রথমটা ওর বিভৎস মুখ দেখে চমকে উঠেছিলাম। মাথার মাঝ-

খান থেকে মুখের বাঁদিক দিয়ে চোখের কোণ ঘেঁষে অব্দি চওড়া একটা বিরাট ক্ষত ওর মুখটাকে বিভৎসতায় বিকৃত করে দিয়েছে। সুঠাম চেহারায় অমন বিকৃত মুখ দেখেই মনে হয়েছে লোকটা খুনী। নিশ্চয়ই কোনো দাঙ্গায় কেউ তাকে কুকরী দিয়ে আঘাত করেছে।

সামনে দাঁড়িয়ে ছিল যতক্ষণ ততক্ষণ বিশ্রী অস্বস্তি ভোগ করছিলাম। লক্ষ্য করে দেখি বাঁ-দিকের গালে মাংস নেই। পাতলা লালচে চামড়া ঢাকা। কথা বললে পাতলা চামড়ার ভেতরে দাঁতগুলো দেখা যায়। গলায়ও অনেকগুলো গভীর ক্ষতচিহ্ন।

পরদিন সকালে যখন আমরা সুন্দরডুঙ্গা অভিযানের পথ কাপকোট থেকে যাত্রা করলাম তখন দেখি বিভৎসমুখ লোকটি আমাদের মালবাহকের কাজ করছে। অস্বস্তি বাড়ল আরো।

মূল শিবির পর্যন্ত লোকটি আমাদের সঙ্গে ছিল। ওর ওই বিভৎস মুখ আমি কোনদিনই সহ্য করতে পারি নি। ফলে মূল শিবির তৈরির পর একদল ছাঁটাই মালবাহকের মধ্যে লোকটিও পড়ে গেল। অনেকেই অনুরোধ করল তাদের কাজে বহাল রাখার জন্য। কিন্তু বিভৎসমুখ লোকটি কোনো আবেদন জানায় নি। স্বাস্ত বোধ করেছিলাম।

এরপর অভিযানের বৈচিত্রের মধ্যে ওকে ভুলে যেতে দেরি হয় নি। এতদিন বাদে মাধোরামকে দেখে তাই থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। অস্বস্তি বোধ করেছিলাম ওর ঘরে যেতে। কিন্তু ওর ঘরে গিয়ে সুন্দরী বউটিকে দেখে বিস্মিত হয়েছি। অমন বিভৎস খুনী মানুষের ঘরে অত রূপসী মেয়ে থাকে কেমন করে।

—আগয়া সাহাব।

মাধোরামের গলা শুনে চমকে উঠলাম। থমকে দাঁড়ালাম। অন্ধকার নেমে এসেছে প্রায়। সূর্য অস্ত গেছে অনেক আগেই। মেট বলে গেছে নিচে অপেক্ষা করবে আমার জন্য। ডাক্তার অমিয় হাটিকে তাই ছেড়ে দিয়েছি অনেক আগে। ওরা আমার জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে নিচে। মাধোরামের ঘরে যাওয়ায় বেশ দেরি হয়ে গেছে। আবার লোকটা এল কেন?

—কি ব্যাপার? আবার এলে কেন মধুদা? মিষ্টি করেই বললাম।

—আপনি একলা, সেই জন্যে এলাম। সামনের পথ তো ভাল নয়। মাধোরাম চলল আমার পাশে পাশে।

—আমি একাই যেতে পারব। তুমি কেন আবার আমার জন্য কষ্ট করবে মধুদা?

—কষ্ট কিসের সাব? আমরা পাহাড়ী মানুষ। অভ্যেস আছে।

—বউ মত দিয়েছে? নাকি নিজেই চলে এলে?

লাজুক হেসে বলল মাধোরাম, বউ পাঠিয়েছে।

—আমাকে এগিয়ে দেবার জন্য? অবাক হলাম।

পিণ্ডারী নদীর তীরে পৌঁছে দেখি কেউ কোথাও নেই। ডাকলাম মেটকে। প্রতিধ্বনি ফিরল কেবল। মনে মনে ভয় পেলাম। দারুণ অন্ধকার এ জায়গাটা। বড় বড় গাছের ছায়ায় দিনের বেলায় অন্ধকার হয়ে থাকে, এখন তো রাত।

মাধোরাম আমার পিছনে পিছনে এগিয়ে আসছে। পুল পার হয়ে এপারে চড়াই রাস্তাটা খুঁজে পেতে বিশেষ কষ্ট হল না। এবার নিশ্চয় মাধোরাম ফিরে যেতে চাইবে। ঘরে ওর যুবতী বউ একা। তাছাড়া কর্তব্যবোধে আমার জন্য এতটা পথ এসেছে এই যথেষ্ট। অথচ মনে হচ্ছে মাধোরাম সঙ্গে থাকলে ভালই হত।

বেশ কিছুটা চড়াই উঠে বিশ্রাম নেবার জন্য দাঁড়ালাম। মাধোরামকে বললাম, অনেকটা তো এসেছ, এবার ফিরে যাও।

—কাঁহা?

—তোমার ঘরে।

—বউ আপনার সঙ্গে যেতে বলেছে। অন্ধকার পথে আপনাকে ফেলে ঘরে গেলে রক্ষে আছে?

—আজ রাতটা তাহলে আমাদের সঙ্গেই থাকবে?

—জী সাব।

মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে বেশ খুশি হলাম। ভরসা

পেলাম তবু বললাম, আমি তো এখন সোজা যেতে পারি। তুমি আমার জন্য কেন তকলিফ করবে মধুদা ?

—পথ ভাল আছে বটে কিন্তু ভাল্লুকও আছে। চাপা গলায় বলল মাধোরাম।

—তোমার ভাল্লুকে ভয় নেই ?

—আগে ছিল সাব। এখন নেই।

—মানে ?

এই একটা ছোট প্রশ্নের জবাবে জানলাম বিভৎসমুখ মধুদা ওরফে মাধোরামের জীবনের এক রোমহর্ষক ঘটনা। আর এই ঘটনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটা মিষ্টি কাহিনী, ছোট গল্পের মতো।

…গরীব ঘরের ছেলে মাধোরাম, আদর করে সবাই ডাকে মধু। রাখালের কাজ করে দিন গুজরান করে। বাপ-মা মরা মধু ওয়াছামের গ্রামপ্রধানের ঘরে মানুষ হয়েছে। ভেড়া বকরী নিয়ে চলে যায় সুন্দরডুঙ্গা উপত্যকায়। বছরের ছটা মাস চাষবাসের সময়। এ সময়টা ঘাসের অভাব হয় বলে ভেড়া নিয়ে বেরুতে হয় গ্রাম ছেড়ে। পাহাড়ে অরণ্যে আছে প্রচুর ঘাস আর লতাপাতা। একটানা ছ'-সাত মাস ধরে ভেড়া বকরী ঘাস খেয়ে নেয় এখানে। তারপর ছ' মাস বিশ্রাম।

সে বছর ভেড়া চরিয়ে ফিরছে। গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ। অরণ্যটুকুকে ওরা সবাই সমিহ করে চলে। নন্দামাতার নামগান করতে করতে অরণ্য অতিক্রম করে। এখানেই ভয়টা বেশি। বড় বড় আকাশ ছোঁয়া গাছ। কোন গাছ থেকে কখন যে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো সেই দানব এসে সামনে দাঁড়ায় কে জানে। চোখ কান সজাগ রেখেই চলার রীতি। চলছিলও তাই ওরা দুজন। মাধোরাম আর সুন্দর সিং।

হঠাৎ বিভীষিকার মত কাল একখণ্ড মেঘ যেন নেমে এল ওদের সামনে। ভেড়াগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে লাগল দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। কিছু ভেড়া ভয়ে পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে সেঁটে

গিয়ে কাঁপছে। কাঁপছে সুন্দর সিংও। হতভম্ব মাধোরাম! নিজের চোখদুটোকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

মেঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের দু'জনের উপর। মাধোরাম দেখল সুন্দর সিং ক্ষতবিক্ষত। তার পর তার দেহটা হঠাৎ শূন্যে উঠে গেল। এবার এল মাধোরামের পালা। বিভীষিকা ওকে যেন আদর করল। তীক্ষ্ণ নখওলা একটা হাত দিয়ে মাথা থেকে মুখ পর্যন্ত বুলিয়ে দিল। অসহ্য একটা যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় ওর দেহটা যেন ধনুকের মতো বেঁকে গেল। ছিটকে পড়ল দূরে। বিভীষিকা আর যন্ত্রণায় সব অনুভূতি হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল চেতনা।

চেতনাটা ফিরল একদিন। কেউ কিন্তু আশা করে নি। আজ পর্যন্ত ওই বিভীষিকার মুখোমুখি হয়ে কারোরই চেতনা ফেরেনি নাকি। সুন্দর সিংয়ের দেহটা বেশি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছল। সে দেহে কিন্তু প্রাণের কোনো স্পন্দন ছিল না।

জ্ঞান ফিরে জানল ওকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দু'দিন বাদে অপর আর একদল রাখাল তুলে নিয়ে আসে জাতোলী গ্রামে। গ্রাম্য বৈদ্যের চিকিৎসা আর একটি নরম হাতের অক্লান্ত সেবায় মৃতপ্রায় মাধোরাম বেঁচে যায়। সুন্দর সিং মারা গেছে শুনে বড় আঘাত লেগেছিল ওর মনে।

বিভীষিকাটি—পাহাড়ী ভাল্লুক। উচ্চতায় প্রায় দশ বারো ফুট। সারা গায়ে ঘন লোম। আর হাতের পায়ের আঙুলে তীক্ষ্ণ নখ। কুমায়ুণের মানুষের বিশ্বাস যে লোক ভাল্লুকের হাত থেকে প্রাণে বাঁচে সে অমর। স্বয়ং নন্দাদেবীর বর লাভ করে।

—সেই জন্য ভাল্লুককে এখন আর ভয় পাওনা! জিজ্ঞাসা করলাম।

হাসল মাধোরাম। বলল, ভাল্লুক আর আমায় আক্রমণ করবে না সাহাব।

—কেন? তুমি নন্দামাতার বর পেয়েছ বলে?

—আমার এই মুখ দেখলে ভল্লু ভয় পেয়ে পালাবে। হাহা করে

হেসে উঠল মাধোরাম। হাসি তো নয়, যেন অট্টহাসি। নিস্তব্ধ অরণ্যে সেই হাসি বিচিত্র ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে ফিরল।

মধুদার মুখটা যদি দেখতে পেতাম এখন।

মাধোরাম এল সেই কাপকোট পর্যন্ত। ওকে প্রতিদিনই ফিরে যেতে বলেছি।

যায়নি।

আমাদের বিদায়ের দিন সকাল থেকে খেটেছে। নদী থেকে টাউট মাছ ধরে নিয়ে এসেছে। নিজে তদারক করে রান্না করিয়েছে। পরিবেশন করেছে নিজের হাতে। মালপত্র গোছগাছ করে বাসের মাথায় তুলে দেবার তদারকিটাও করতে ভোলেনি।

বাস ছাড়ার আগে ওদের কাছে বিদায় নেবার সময় মাধোরামের হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিলাম। বললাম, মিষ্টি খেও।

টাকা ক'টা ফেরত দিল মধু। বলল, বউ বারণ করেছে টাকা নিতে।

কপট ধমকের সুরে বললাম, বউকে বল আমি নিজে দিয়েছি তোমাদের মিষ্টি খেতে। রাগ করবে না।

বাস ছাড়ল। মাধোরাম ওরফে মধুদার হাতে টাকা ক'টা গুঁজে দিয়ে চলন্ত বাসে উঠে পড়লাম। বিভৎস গভীর ক্ষত চিহ্ন আঁকা মুখের যেদিকটায় মাংস নেই, যেদিকটার গালে পাতলা লালচে চামড়া আর তার নিচে আধপাটি দাঁত দেখা যায়—সেই গাল বেয়ে চোখের কোণ থেকে নেমে আসা ক' ফোঁটা জল পড়ন্ত রোদের আলোয় চিক-চিক করে উঠল। মধুদার এই মুখে বিভৎসতার কোন চিহ্ন নেই। আর এই রূপটাই বুঝি ধরা পড়েছিল সেদিনের ক্ষতবিক্ষত হয়ে মরে যাওয়া জাতোলী গ্রামের সুন্দর সিংয়ের মেয়ে শোড়শী সহেলীর চোখে। যার সেবায় সেদিন মাধোরাম প্রাণ পেয়েছিল। পেয়েছিল কোমল হৃদয়ের স্পর্শ।

নেপাল পরিক্রমা করে ফিরছি পোখরার দিকে।

শরতের শেষ। আকাশে বাতাসে আসন্ন ঋতু বদলের ছাপ স্পষ্ট। ভোরের দিকে শীতের তীব্রতা বড় বেশি। বেলা বাড়লে গায়ে জ্বালা ধরে। আবার বিকালে নরম শীতের মাদকতা। আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের সম্ভার আর হাল্কা হিমেল হাওয়ায় ঋতু বদল বোঝা যায়। শীত আসছে।

নাম না জানা একটা গ্রাম পার হয়ে সামনে কঠিন চড়াই। চড়াই পথ গভীর অরণ্যলোকে আবৃত। মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। চড়াই পার হলেই পাওয়া যাবে শিখা গ্রাম। হিসেব মতো আজ ওখানেই রাতের বিশ্রাম। কিন্তু হিসেব আমাদের গরমিল হয়ে গেছে। এখন ভাবনা আশ্রয় পাব তো?

আজ দু'দিন এ-পথে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তারপর আর ভাল কিছু আশা করা উচিত নয়। তবু শিখা গ্রামকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে চলেছি, না হলে পথ যে কোনদিনই শেষ হত না। এছাড়াও মনের নিভৃতে একটুকরো আশা আছে—নেপালের অচ্ছুৎ সমাজ থ্যাকালি অধ্যুষিত শিখা গ্রামে আমরা আশ্রয় আর খাদ্য পাবই।

অদ্ভুত সমাজ ব্যবস্থা নেপালের গহন হিমালয়ে। হিন্দুদের নানা জাত সেখানে—একে অপরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাস করছে। থ্যাকালিরা অস্পৃশ্য জাত, যদিও ওরাও হিন্দু। থ্যাকালিদের হাতে বর্ণ হিন্দু থেকে শুরু করে বৌদ্ধরাও জল খায় না। ওদের স্পর্শে নাকি জাত যায়।

আমরা অভিযাত্রী—বর্ণ বা জাতের বালাই নেই। তবু পথ-প্রদর্শকের অনুরোধে আসার সময় শিখা গ্রামে রাত কাটাইনি বা জল স্পর্শ করিনি পাছে যাত্রা পথে বিঘ্ন ঘটে।

মানুষ ভাবে এক আর ঈশ্বর করেন এক।

গরমপানীতে পথপ্রদর্শক রাত কাটাবার জন্ত গ্রামে গেছল। পরদিন সকালে ফেরার কথা। আমাদের খাবার ওই তৈরি করে দিত। সেদিন পথশ্রমে আমরা এতই কাহিল যে চা-টুকু বানাবার মতো শারীরিক সামর্থ্য ছিল না কারো। শেষে আমাদের কুলি খড়গ-বাহাদুরকে রাতের খাবার বানাবার দায়িত্ব দিই।

খড়্গবাহাদুর প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না। অবশেষে আমাদের চাপে পড়ে বলে আমরা নীচু জাত, আমাদের হাতের জলও অস্পৃশ্য হিন্দু-বৌদ্ধদের কাছে। আপনাদের জাত যাবে বাবুজী।

—জাত আবার যায় নাকি? আর গেলে আমাদের যাবে, তোমার কি?

—নহি সাহাব, মেরা পাপ হোগা।

ধুত্তোর পাপের নিকুচি করেছি। পাপ-টাপ সব আমাদের তৈরি। খানা বানিয়ে ফেল, তুমহারা কুছ নহি হোগা বাবা।

খড়্গবাহাদুর খানিক কি ভেবে বলল, ঠিক হ্যায় সাহাব, ম্যায় ভি জাত নহি মানতা হুঁ। খানা পাকাব, কিন্তু কেউ যেন না জানতে পারে। জানলে আপনারা বিপদে পড়বেন।

গরমপানীর কাঠের দোতলার নিভৃত কোণে রসুই যখন পাকছে তখন আমাদের ভাত-পানীতে মারার ষড়যন্ত্র চলছে বাইরে। কেমন-ভাবে যেন ফাঁস হয়ে গেছে নীচুজাত থ্যাকালির হাতে আমরা খানা খাচ্ছি।

সকালে উঠে সব পরিষ্কার। পথপ্রদর্শক ভোরবেলায় গ্রাম থেকে ফিরে কথাটা শোনে। তারপর অগ্নিশর্মা হয়ে খড়্গবাহাদুরকে বেশ দু'চার ঘা বসিয়ে দেয়। আমরা বাধা না দিলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটেই যেত। কারণ, আজ খড়্গবাহাদুর দাঁড়িয়ে মারখাবার পাত্র ছিল না।

গরমপানীতে সব গরম হয়ে আমাদের সঙ্গ ছাড়ল। খড়্গবাহাদুরকে ওখানকার থ্যাকালিরা সরিয়ে নিয়ে গেল। ও থাকলে অশান্তি বাড়ত বলে।

আমরা পরিত্যক্ত। অনেক মালপত্র। একজনও মালবাহক যোগাড় করতে পারলাম না গরমপানীতে। কেউ আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি নয়। শেষে অতি প্রয়োজনীয় মালগুলো পিঠের রুক স্যাকে তুলে বেরিয়ে পড়ি।

গরমপানীর শনি আমাদের পিছু নিয়েছে। দু'দিন কোথাও পাইনি সামান্য এক পেয়ালা চা বা মাথা গোঁজার মতো আস্তানা। খাদ্য আর আস্তানার ভাবনা ভাবিনা তেমন। হিমালয়ের গহন কন্দরে কত বারই না আশ্রয় আর খাদ্য ছাড়াই দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে। কিন্তু হিমালয়ের মানুষের উদার উষ্ণ আতিথ্য থেকে বঞ্চিত হবার মানসিকতা আমায় পীড়া দিচ্ছে বেশি।

এক পা এক পা করে কঠিন দুস্তর চড়াই পথে উঠছি। পথ যত শেষ হয়ে আসে অরণ্যের গভীরতাও ততো কমে আসে। এক সময় চড়াইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখি নিচে ছবির মতো সুন্দর শিখা গ্রাম। চুয়ার টকটকে লাল শীষ সারা গ্রামটাকে যেন আগুনের লকলকে শিখায় ঘিরে রেখেছে! এ জন্যই কি এ গ্রামের নাম শিখা? হবে হয়তো।

সমুদ্র-ক্লান্ত নাবিক যেমন তটভূমির দেখা পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়, পদযাত্রীরাও তেমন জনপদ দেখলে উল্লসিত হয়। আসন্ন বিশ্রামের প্রত্যাশায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আমাদের বেলায় স্বস্তির বদলে কেমন অনিশ্চিত অস্বস্তিই বোধ হচ্ছে।

অচ্ছুতের হাতে খানা খেয়ে জাত গেছে আমাদের। তাই কারো কাছে আশ্রয় পাব না, যেমন পায়না এদেশেরই মাটির মানুষ থ্যাকালি সম্প্রদায়ের হিন্দুরা।

শিখা গ্রামে যখন ঢুকলাম তখন দিনান্তের সূর্য অস্তগামী। পশ্চিমের দিগন্তজোড়া সবুজ সমতলের কোলে থালার মতো সূর্যটা অস্ত যাবার আয়োজনে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ বাদেই গভীর অন্ধকারের বুকে মুখ লুকাবে শিখা গ্রাম।

শিখা গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরলাম আশ্রয়ের

সন্ধানে। যারা বর্ণ হিন্দু তারা তো কথাই বলল না, আর অচ্ছুৎ থ্যাকালিরা সবিনয়ে এড়িয়ে গেল। থ্যাকালিদের কাছে বিমুখ হয়ে সত্যি অবাক হলাম। বুঝলাম, আমাদের নামে তাহলে অন্য আরো কিছু প্রচার হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও কারো মুখ থেকে কথা বার করতে পারলাম না। জানলাম না আমাদের কি অপরাধ।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বসে না থেকে পথ চলাই ভাল। তাতে দৈহিক ক্লেশ হলেও মানসিক বিপর্যয় কম হবে। সারারাত হাঁটা মনস্থ করে বোঁচকা পিঠে বেরিয়ে পড়লাম পথে।

অন্ধকার নেমে এসেছে উপত্যকায়। গ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। দুপাশে ক্ষেত আর ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছি হিমালয়ের পথে কত উষ্ণ আতিথ্যই না পেয়েছি। পেয়েছি হিমালয়ের মানুষের হৃদয়ের উত্তাপ। আর আজ হিমালয়ের গহনে হিমালয়ের মানুষের নিকট সান্নিধ্যে থেকেও তাদের আতিথ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। আমার পরিব্রাজক জীবনে এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। সামনে ছোট্ট একটা ছেলে। নেপালী ভাষায় কি যেন বলল, বুঝলাম না। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে পিছনের দিকের একটা বাড়ি দেখাল। তারপর আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল বাড়িটার দিকে।

বাড়ির দরজায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করল। হিন্দীতে বলল, অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছেন? থাকার জায়গা পাননি তো?

আমি বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইলাম মেয়েটির মুখের দিকে।

—ভেতরে আসুন, বাইরে হিম পড়ছে।

মন্ত্রচালিতের মতো ঘরে ঢুকে পড়লাম। এক ধারে চারপাই একটা। আমাদের বসতে বলল ওতে। বসলাম।

—মুখ দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন কিছুই জোটেনি কপালে। চা খাবেন?

বোকার মতো বলে বসলাম, চা পাওয়া যাবে?

—নিমক-চা, না সক্‌কর-চা ?

—যা আছে তাই দাও।

মেয়েটি পাশের ঘরে ঢুকে গেল। তখনও আমাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। ছ'দিন আশ্রয় আর খাদ্যহীন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিশ্বাস-বোধটাই কেমন ভোঁতা হয়ে গেছল। তাই এমন আচমকা আশ্রয় আর চায়ের কথা শুনে বিশ্বাস হচ্ছিল না।

মেয়েটি ফিরে এসে বলল, আপনারা চা বানিয়ে নিন। সব জোগাড় করে দিয়েছি। খাবার জোগাড়ও করা আছে, একটু তকলিফ করে বানিয়ে নিতে হবে। আমরা অস্পৃশ্যজাত, না হলে নিজের হাতে যত্ন করে বানিয়ে দিতাম।

মেয়েটির কথাগুলো বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে লাগল।

নড়েচড়ে বসে বললাম, আমাদের তো জাত নেই কোনো। তোমার হাতেই আজ খানা খাব।

—সত্যি ? মেয়েটি যেন কৌতুক করল।

—থ্যাকালি খড়্গাবাহাদুরের হাতে খানা খেয়েও যখন জাতটা আছে দেখছি, তোমার হাতে খেলে আর কতটা খোয়া যাবে ? কিন্তু আমাদের আশ্রয় দেবার খেসারত তোমায় দিতে হবে না গাঁয়ের মানুষের কাছে ?

মেয়েটি খানিক চুপ করে থেকে বলল, আজ পর্যন্ত অনেক খেসারত দিয়েছি, আর একটা রাতের জন্য মুসাফিরের সেবায় না হয় আরো কিছু দিলাম। মেয়েটি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় বলে গেল, আরাম করুন এখুনি চা নিয়ে আসছি।

খাওয়ার পর্ব চুকতে রাত অনেকটা গড়িয়ে গেছল। মেয়েটি পাশে বসে যত্ন করে খাইয়েছে প্রচুর। খাওয়ার পর আমাদের শোবার বন্দোবস্ত করে ছোট ছেলেটিকে কোলের কাছে নিয়ে কিছুটা তফাতে শুয়ে পড়ল।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ঘরের মধ্যে অনেকগুলো মানুষের নিঃশ্বাস। সবাই ঘুমে অচেতন প্রায়। বিগত ছ'দিনের

মানসিক অশান্তি থ্যাকালি মেয়েটির করুণা স্পর্শে মুছে গেছে। হিমালয়ের মানুষের এই উষ্ণ উদার আতিথ্যই আমার জানা আছে আজ দু'দিন যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এদেশের মানুষের ওপর এক বিতৃষ্ণা নিয়েই ফিরছিলাম। এই মুহূর্তে বিতৃষ্ণার বদলে এপথের মানুষের ওপর আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে।

শিখা গ্রাম থেকে বেরিয়েছি ভোরে। মেয়েটি আমাদের জন্যে একটা খচ্চর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। খচ্চরের পিঠে মালপত্র তুলে এগিয়ে চলেছি পোখরার দিকে।

পথ চলতে চলতে বারবার শিখা গ্রামের মেয়েটির কথা মনে পড়ছে। বছর তিরিশেক বয়েস হবে। চেহারায় অদ্ভুত আভিজাত্য। থ্যাকালিদের ঘরের মেয়েদের মতো নয়। নাম জিজ্ঞাসা করতে হাল্কা হেসে বলেছিল, নাম দিয়ে কি হবে। আমায় ডাকার দরকার হলে বহিনজী বলেই ডাকবেন। নানা আলোচনার মধ্যে মাঝে মাঝেই ওকে নিজেদের জাতের আর সমাজের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠতে দেখ-ছিলাম। হিমালয়ে ঘোরার জীবনে অনেক মানুষ পেয়েছি, কিন্তু এমন তেজময়ী সপ্রতিভ নারী আমার চোখে পড়েনি। হিমালয়ের মানুষ প্রতিবাদ করতে জানে না। অত্যাচার অনাচার আর শোষণের ষ্টীম রোলারের নীচে পিষ্ট হলেও মুখ দিয়ে ওরা রা করে না। নিভৃতে চোখের জল ফেলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় প্রতিকারের।

পরদিন পোখরার কাছাকাছি পথে খড়্গাবাহাদুরকে দেখে বিস্ময়ে আনন্দে জড়িয়ে ধরলাম।

—কাঁহাসে আয়া খড়্গাবাহাদুর? ইতনা দিন কাঁহা থা ভাই?

—আপলোগকো পিছে।

—দেখা করনি কেন? পথে যে কি ভাবে দিন কেটেছে তা ঈশ্বরই জানেন।

—আমিও জানি সাহাব। শিখা গ্রামের আমার জাতের মানুষও যে আপনাদের আশ্রয় দেয়নি সেটাই দুঃখের। ওদের তরফে আমি ক্ষমা চাইছি।

—শিখা গ্রামের মানুষের ওপর আমাদের কোন ক্ষোভ নেই। এক নাম-না জানা বহিনজী আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। সেই তো এই খচ্চর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাছাড়া দু-দিনের মতো খাদ্যও দিয়েছে সঙ্গে।

মৃদু হাসল খড়্গাবাহাদুর।

—মেয়েটিকে চেনো?

—জী সাহাব। নাম ওর লছমীবাঈ। বড় ভাল মেয়ে।

—লছমীবাঈ কি তোমাদের জাতের মেয়ে?

খড়্গাবাহাদুর একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর মাথা নেড়ে বলল না, ও আমাদের জাতের মেয়ে নয়। ক্ষত্রিয় বংশের শিক্ষিত মেয়ে।

—তবে থ্যাকালি হল কেমন করে।

হাসল খড়্গবাহাদুর। বলল লছমীবাঈয়ের বিচিত্র কাহিনী। ওর কাহিনী গল্পের মতো লাগল আমার।

…পদমবাহাদুর প্রধান শিখা গ্রামের এক হোমরাচোমরা মানুষ। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে কমিশন র‍্যাঙ্কে চাকরী করার সুবাদে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল আশপাশের আর পাঁচটা গ্রামে। হাজার হাজার সাধারণ সেপাইএর মধ্যে অমন একজন জাঁদরেল অফিসার থাকা যে কোনো গ্রামেরই গর্ব। শিখা গ্রামের মানুষও পদমবাহাদুর প্রধানকে নিয়ে গর্ব করত।

সৎ ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে হয়েও ঠিক ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করত না বলে প্রবীন মহলে আলোচনা হত প্রধানজীকে নিয়ে। তবে সে আলোচনা সমালোচনা কখনো সোচ্চার ছিল না। পাঁচজনের কান বাঁচিয়েই সমালোচনা হত। আড়ালে হলেও মাঝে মাঝে কানে আসত পদমবাহাদুর প্রধানের। মনে মনে হাসতেন প্রধানজী। আর যে খবরটা কানে তুলে দিত তাকে বলতেন, জাত জাত করে নিজেদের আমরা দুর্বল করে ফেলছি। ইওরোপের কোথাও জাতের

বিচার নেই। আর সেই জন্যে ও-জাত অত বড়।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পদমবাহাদুর বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর কল্যানে পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরে জাতের বিচার একটা মস্ত ধোঁকা বুঝলেও হিমালয়ের নিভৃতে যেখানে সভ্যতার আলো তেমন প্রবেশ করেনি সেখানকার মানুষ সমাজের প্রচলিত আচার বিচার আর বিধিনিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে সে সত্য বুঝবে কেমন করে।

লছমীবাঈ বাবার আদর্শে মানুষ। ছোটবেলা থেকেই নীচুজাত থ্যাকালিদের ছেলেমেয়েই ছিল ওর সঙ্গী। প্রথম দিকে শিশু বলে লছমীর মেলামেশাটাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখেনি কেউ।

পদমবাহাদুর প্রধান বছরের দশমাস বিদেশে থাকত, দু'মাস মাত্র থাকতে পেত গ্রামে। পদমবাহাদুরের অনুপস্থিতে যদিও বা থ্যাকালি-দের সঙ্গে মেশার জন্য সমালোচনা হতো মেয়ের, কিন্তু প্রধানজী গ্রামে ফিরলে সবাই মুখে কুলুপ আঁটত।

সেবার পদমবাহাদুর দূর প্রাচ্যের কোথায় যেন যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত এমন সময় জরুরী বার্তা পেল স্ত্রীর। শিগগীর দেশে ফেরার তাগিদ এসেছে। পদমবাহাদুর বুঝতে পারেননি কি এমন ঘটনা ঘটল যে তড়িঘড়ি নেপালে ফেরার তলব এলো। ভাবলেন হয়তো স্ত্রী নয়তো কন্যা লছমীর কোনো বিপদ ঘটেছে।

অনেক তদবির করে ছুটি আদায় করলেন পদমবাহাদুর।

একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে গ্রামে ফিরে এলেন।

পোখরা থেকে পায়ে হাঁটার সময় নানা কথা কানে আসতে লাগল। শিখা গ্রামে পৌঁছে হতভম্ব। যারা একদা তাঁকে দারুণ খাতির যত্ন করত, তারা ফিরেও তাকাল না তাঁর দিকে। সবার মুখ কেমন গম্ভীর।

বাড়ি এসে জানলেন সব।

স্ত্রীর কাছে শুনলেন, লছমীর থ্যাকালিদের সঙ্গে মেলামেশা আর তাদের ঘরে জলগ্রহণের জন্য সারা গ্রামের বর্ণ হিন্দুরা চটেছে। ওদের সমাজচ্যুত করে একঘরে করেছে।

সব শুনে পদমবাহাদুর গেলেন গ্রামের মুখীয়ার বাড়ি। দেখা করে বোঝালেন নীচু জাত বলে কিছু নেই। সবাই ঈশ্বরের সন্তান। বিদেশের কোথাও জাতের বিচার নেই। সবাই খানা পিনা কাজকর্ম এমন কি বিয়ে-থা পর্যন্ত জাতের বিচার না করেই করে।

মুখীয়াও বড় একরোখা লোক। দু'বেলা পূজা আহ্নিক করেন। দেবতাকে উৎসর্গ না করে জল স্পর্শ করেন না। নীচু জাতের ছায়া মাড়ালেও প্রচণ্ড শীতে বরফ গলা জলে ডুব দিয়ে গোঁচনা খেয়ে তবে শুদ্ধ হন। এমন ধর্মভীরু মানুষকে বিদেশের কথা দিয়ে বোঝান যায় না।

মুখীয়া গম্ভীর ভাবে বললেন, জাত তোমাদের অনেক আগেই গেছে। শুধু ভাল চাকরী কর বলে আমরা সবাই সহ্য করেছিলাম। এখন তোমার মেয়ে আর বউ নীচু জাতের ঘরে খানাপিনা করতে শুরু করেছে। ভগবানের রোষ পড়লে কেবল তোমরা নও গ্রামের প্রত্যেকে তার ফল ভোগ করবে।

পদমবাহাদুর হার মানলেন। বেদনা ভরা হৃদয়ে মুখীয়ার বাড়ি থেকে বেরুবার মুখেই হঠাৎ মুখীয়া বললেন, আর কোনো দিন আমার বাড়িতে ঢুকবে না। কিছু কথা থাকে তো দেউড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে বলবে। তোমার জন্য আজ আমার আধমণ গোবর লাগবে বাড়ি শোধন করতে।

পদমবাহাদুর প্রথমটায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেল। জোরে জোরে পা-ঠুকে বেরিয়ে এলেন।

কয়েক দিন বাদে শিখা গ্রামের ঘরবাড়ি জায়গা জমি এক থ্যাকালির হেপাজতে রেখে কাঠমাণ্ডুতে চলে এলেন পদমবাহাদুর স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে।

কাঠমাণ্ডুর বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখতে লাগল লছমীবাঈ। শহরের জীবনে অনেক নতুনত্ব তবু যেন শিখা গ্রাম অদ্ভুত এক আকর্ষণে টানে লছমীকে। মাঝে মাঝেই মাকে নিয়ে চলে আসে শিখা গ্রামে। ক'দিনের নির্বাসন জীবন হলেও কিসের এক স্বাদ পায় মেয়েটা তা সেই জানে।

স্কুল ছেড়ে কলেজে পা দিতেই বিদেশে বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনল লছমী। মা ভেঙ্গে পড়েছিল। লছমী মাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে জীবন সংগ্রামে ভাসতে থাকল।

বৈধব্য জ্বালা বেশিদিন সইতে হয়নি মাকে। বছর গড়াতেই লছমী হারাল মাকে। বিরাট পৃথিবীতে ও তখন একা—অবলম্বন হীন।

শিখা গ্রামে ফিরে এলো লছমীবাঈ।

বর্ণ হিন্দুরা আড়ি পাতল। একটা মেয়ে একাকী কিভাবে জীবন কাটায়?

ক'দিন বাদেই নিজের বাড়িতে স্কুল খুলল লছমী।

গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে অনুরোধ জানাল, তার বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের দিতে। সামান্য মাইনে দিলেই চলবে। একটা পেট চালিয়ে নেবে কোনো মতে।

এক এক ঘরে এক এক উত্তর শুনল লছমী। কেউ বলল, যার জাত নেই সে আবার কি পড়াবে? কেউ বলল, নীচ জাতের ঘরে ছেলে পাঠিয়ে শেষে নিজের জাত খোয়াব?

অবশেষে লছমীবাঈ থ্যাকালিদের ঘরে গেল। বলল, বর্ণ হিন্দু ছাড়া পাঠশালায় তোমাদের কারো ছেলের পড়ার অধিকার নেই। আজকের দিনে এটা চলতে পারে না। ওদের ছেলেদের মতো তোমাদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখার অধিকার আছে। খোদ কাঠ-মাণ্ডুতে এ অধিকার সবার। জাতের বিচার নেই সেখানে।

কাজ হল এতে। অনেকেই তাদের ছেলে মেয়েদের লছমীবাঈ-এর পাঠশালায় পাঠালো। চোখ টাটাল মুখীয়ার। ষড়যন্ত্র দানা পাকাতে লাগল গ্রাম প্রধানের প্ররোচনায়।

হঠাৎ একদিন গ্রামে বাজ পড়ার মতো একটা খবর ছড়াল। লছমী থ্যাকালিদের এক যুবককে বিয়ে করেছে!

ডাক পড়ল লছমীর আর সেই থ্যাকালি যুবকের। বিচার সভায় ওরা গিয়ে দাঁড়াল। স্বীকার করল যে তারা বিয়ে করেছে।

মুখীয়া আদেশ দিল গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধার জন্য।

লছমী কানেই তুললনা সে কথা।

হিন্দু আর বৌদ্ধরা এক জোট হল ওদের বিরুদ্ধে। জমি জমা বাজেয়াপ্ত করা হল। অন্য থ্যাকালিদের চোখ রাঙিয়ে ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। তাতেও দমল না লছমী আর তার যুবক আদমী।

গ্রামের শেষপ্রান্তে ওরা নতুন করে বাসা বাঁধল। স্বামিকে মাল-বাহকের কাজ নিতে বলে লছমী নিজে দুটো খচ্চর নিয়ে পোখরায় যাতায়াত করতে লাগল।

উদয় অস্ত খেটে চলেছে ওরা সেই বিয়ের পর থেকে আজ প্রায় আট দশ বছর। ইতিমধ্যে সংসারে একটা নতুন মানুষ এসেছে। তার শিক্ষার দরকার। লছমী ভাবছে এবার একটা পাঠশালা আবার খুলবে। থ্যাকালিদের ছেলেমেয়েদের জন্য। আশার কথা এতদিনে থ্যাকালিরা বুঝতে পেরেছে বর্ণ হিন্দুরা কি অত্যাচারটাই না চালাচ্ছে। থ্যাকালিরা এখন ধীরে ধীরে লছমীবাঈএর পক্ষে আসছে।

পোখরায় পৌঁছেই খড়্গাবাহাদুর আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওকে একদিন আটকাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অন্য আর এক অভিযাত্রী দলকে মদত দিতে ওকে আজই যেতে হবে, তাই ছেড়ে দিলাম।

খড়্গাবাহাদুর চলে যাবার পর হঠাৎ একটা মুখের সঙ্গে ওর বড় আদল খুঁজে পেলাম যেন। হয়তো আমার ধারণা ভুল। তবু মনে হচ্ছে শিখা গ্রামের লছমীবাঈএর বছর আটেকের ছেলেটার মুখ আর খড়্গাবাহাদুরের মুখের কোথায় যেন এক অদ্ভুত মিল।

যে লোকটি আমাদের মালপত্র খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে শিখা গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে তাকেই ধরলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, খড়্গা-বাহাদুরকে চেনো?

—জী সাহাব।

লছমীবাঈয়ের কে হয় খড়্গবাহাদুর ?

লোকটা প্রথমে থতমত খেল, তারপর গলা নীচু করে বলল, লছমীর আদমী।

আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় !

লছমীবাঈ খড়্গবাহাদুর আর আট বছরের ছেলেটার মুখ ছবির মতো ভেসে উঠল চোখের সামনে। ওরা একটা নতুন জাত। আদর্শের লড়াই করছে। ওদের লড়াই যেন জয়যুক্ত হয়।

হিমালয়ের পথে পাওয়া লছমীবাঈ যেমন আমার বহিনজী, তেমনই এক উজ্জ্বল মণি যা আমার সংগ্রহের থলিকে করেছে ঐশ্বর্যপূর্ণ।

জাতোলি গ্রাম পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি ঢাকুরি ডাক বাংলোর দিকে। ওখান থেকে লোহারক্ষেত হয়ে কাপকোটে পদযাত্রা শেষ হবে।

অভিযান শেষে ফিরতি পথে ভাবনা নেই। অভিযানের মানসিক যন্ত্রণার ইতি হয়েছে জাতোলি গ্রামে পৌঁছে। এখন পিছু টানের সঙ্গে বিগত দিনগুলোর বিভিন্ন স্মৃতির জাবরকাটা চলছে মনের গহনে।

প্রতিদিনের মতো আজও চলেছি সবার পিছনে। পিছনে থাকতে ভাল লাগে। হিমালয়ের গহনে কত ভাব আর ভাবনা মনের পাতায় উঁকিঝুঁকি দেয়। পাহাড় অরণ্যের বিচিত্ররূপ উপলব্ধি করতে হলে একাত্ম হওয়া চাই। না হলে মুহূর্তের ভাব আর অনুভূতির অস্পষ্ট রেখাগুলো হারিয়ে যায়। এতে পাহাড় ঘোরা হয় দেখাও হয়— উপলব্ধি হয় না।

আজ আমার পথচলার সঙ্গী ভগবান সিং। আমি কাউকেই চাই না চলার পথে সঙ্গী হিসেবে। কিন্তু কেউ যদি থেকে যায় তাহলে উপায় কি ? তবে ভগবান সিংয়ের মত স্বল্পভাষী এবং শান্ত সঙ্গী পথচলার উপলব্ধিতে আঘাত ঘটায় না, বরং সাহায্য করে।

বছর ত্রিশ-বত্রিশের তরতাজা যুবক ভগবান সিং। ওর গতিতে আছে হরিণের তীব্রতা, দেহে অসুরের ক্ষমতা। কিন্তু কি এক আশ্চর্য শাসনে ওর সব কিছুর মধ্যেও একটা শান্ত-মৌনী ভাব। কোন কিছুতেই অহেতুক আগ্রহ নেই—নেই উত্তেজনা। এমন তরতাজা মানুষটার এই নিস্পৃহ শান্ত ভাব যেন বড় বেমানান। হয়তো আনোয়াল ছিল বলে নিজেকে ঠিকমত শাসন করতে পারে। আনোয়ালরা নাকি দেবদূত।

বিগত বিশ-পঁচিশ দিন ভগবান সিং আমার সঙ্গে ছায়ার মতো রয়েছে পাশে পাশে। ওকে অনেক ঘাঁটিয়েছি। শুনতে চেয়েছি ওর অভিজ্ঞতার কথা—আনোয়াল জীবনের কথা। কিন্তু প্রতিবারই আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে নানা ছলে। গাইডের কাছে শুনেছি—ওকে পরীতে পেয়েছিল একবার, তারপর থেকে ও অমন হয়ে গেছে।

পরী অর্থাৎ সুবেশা নারীর রূপধারী অপদেবতা। পরীর দুটো ডানা আছে। ওরা নির্জন পাহাড়-পর্বত আর অরণ্যলোকের শান্ত রাজ্যে বিচরণ করে। পরী ফুল ভালবাসে, ভালবাসে ফুলের মধু। মানুষ ওদের দেখতে পায় না। যদি দেখে তা হলে সমূহ ক্ষতি। মৃত্যু তার অবধারিত। এ বিশ্বাস প্রতিটি পাহাড়ী মানুষের।

ভূত প্রেত জিন আর পরীর রাজ্য পাহাড়—অরণ্য। তাই পাহাড়ী মানুষকেই ভূত প্রেত জিন আর পরীতে পায়। অপদেবতায় ওদের নিদারুণ ভয়। সভ্যতার আলো যেখানে গিয়ে ঢুকেছে সেখানেও কিন্তু অপদেবতার নিত্য আনাগোনা। দুর্গম পাহাড়ে তাদের আস্তানা। অপদেবতার রোষ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য প্রতি গ্রাম আর গঞ্জের ঘরে ঘরে মন্ত্রপুতঃ নানা রঙের কাপড়ের পতাকা উড়িয়ে দেয়। পতাকা-গুলো হাওয়ায় মন্ত্রের বীজ ছড়ায়। অপদেবতা সরে যায় গ্রাম-গঞ্জের ত্রিসীমানা থেকে।

পাইন চীর পিপলের নিবিড় অরণ্যলোকের মধ্যে পথ। আলো-আঁধারের লুকোচুরি চলে সেখানে। ভগবান সিংহ চলেছে পিছনে পিছনে। ঘুরে দাঁড়ালাম। দৃপ্ত ভঙ্গী ভগবান সিংয়ের। ও-ও

দাঁড়িয়ে গেছে। ও-মুখে তো কোথাও ভয়ের চিহ্ন নেই। এ মানুষ ভূতের ভয় পায়? তাহলে পাহাড়ে-পর্বতে ও আমাদের সঙ্গে এতো সাহস দেখাল কি করে? সেখানেও ভূত প্রেত জিন পরীর বাস। তবে কি অন্য কোন কারণ আছে? আছে কি কোন করুণ অব্যক্ত অনুভূতির গোপন কথা?

—ভূত দেখলে ভয় পাও ভগবান?

ভগবান সিং অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন ওকে অবাক করেছে। মাথা নেড়ে জানায় ভয় পায় না।

-- তবে আনোয়ালের কাজ ছাড়লে কেন?

এবার যেন চমকে উঠল ভগবান সিং। উত্তর দিল না। আমারও জেদ চাপছে। ওর মুখে বেদনার কোন চিহ্ন না দেখে সাহস বাড়ল। ওর আনোয়াল জীবনের কথা আমায় শুনতেই হবে। নাহলে হিমালয়ের মানুষ দেখার যে বাসনা নিয়ে আজ একযুগ হিমালয়ের পথে প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি তা যে অপূর্ণ থেকে যাবে। ওকে আঘাত দিয়েই বললাম-- শুনেছি তোমায় পরীতে পাওয়ার পর ভয়ে তুমি আনোয়ালের কাজ ছেড়েছ।

ভগবান সিং থতমত খেয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মুখে যন্ত্রণার বদলে আত্মসম্মানে ঘা লাগার মতো ছাপ।

—তোমার কথা আমি গাইডের কাছে শুনেছি। তোমাদের অনেক মরদকেই তো পরীতে পায়। কারো খারাপ হয় কারো ভালও হয়। তোমার অন্ততঃ খারাপ কিছু হয়নি শুনেছি। কিন্তু কি এমন ভয় তুমি পেলে যাতে আনোয়ালের কাজ ছেড়ে তোমায় মালবাহকের কাজ করতে হচ্ছে?

—ভয় পেয়ে আনোয়ালের কাজ ছাড়িনি। ছেড়েছি, আমার আর আনোয়ালের কাজ করা উচিত নয় বলে।

ভগবান সিং বেশ ঘা খেয়েছে বুঝলাম। মনে মনে আমার ওপর আর গাইডের ওপর চটেছে নিশ্চয়ই। পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরাল ভগবান। আগে আমার সামনে ও কখনো বিড়ি খায়নি।

মুখের রেখা ঘন ঘন বদলাচ্ছে ভগবান সিংয়ের। এ বদল হয়তো আমারই প্রশ্নের অনুকূলে। এবার হয়তো বলবে ওর সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

বিড়িতে ঘনঘন ক'টা টান দিয়ে বলে গেল ওর পরীতে পাওয়ার কাহিনী। সব জায়গায় ও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারেনি। প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে বিচিত্র কাহিনীর মালা গেঁথেছি। ওর মিষ্টি অভিজ্ঞতার কাহিনী যেটুকু আহরণ করতে পেরেছি তার উপজিব্যটুকু তুলে দিলাম।

···লোহারক্ষেতের সামান্য রাখাল ভগবান সিং। কুমায়ুনের মানুষ ভেড়া বকরী চরানো রাখালকে বলে আনোয়াল। আনোয়াল অর্থে দেবদূত। ওরা হিমালয়ের গহন কন্দরে মহেশ-নন্দাদেবীর অঙ্গনে আনাগোনা করে। দেবীর বরপুত্র ওরা। তাই ওরা আনোয়াল— দেবদূত। এই আনোয়ালের মুখে কুমায়ুনবাসী শোনে দেবদেবীদের অলৌকিক কাহিনী। সে সব কাহিনীর সত্যদ্রষ্টা ওরা।

আনোয়াল হতে পারে না সবাই। যদিও গাড়োয়াল কুমায়ুনের দরিদ্র ঘরের প্রায় সব কিশোরই রাখালের কাজ করে। যৌবনে পা দিয়ে রাখালের কাজ করতে চায় না তারা। কিন্তু যারা কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনেও রাখালের কাজ করে তারাই কেবল আনোয়াল হতে পারে। আর একবার আনোয়াল আখ্যা পেলে তারপক্ষে রাখালের কাজ ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। প্রায় কেউই একাজ ছাড়ে না।

সত্যিকারের আনোয়ালরা ব্রহ্মচারী। বিয়ে থা করে সংসারী হতে পারে না তারা। নারীসঙ্গ মহাপাপ আনোয়ালদের। সংসারী হলে আর আনোয়াল থাকতে পারবে না। নন্দাদেবীর শাপ লাগবে যে।

ভগবান সিংও দারিদ্র্যের জ্বালায় রাখাল থেকে আনোয়াল হয়েছে। অভাব না থাকলে বুঝি কেউই আনোয়াল হতো না। আর মা-বাপ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ওকে আওয়ারা-আনোয়াল হতে দিত না তারা। ভগবানও আনোয়াল জীবন ভালবেসে ফেলেছিল। ওর সাহসিকতা এবং ভেড়া বকরীর প্রতি যত্ন লোক মুখে ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভগবানকে পেলে অন্য রাখালকে ভেড়া-বকরী দেয় না কোন মালিক।

ভেড়ার পাল নিয়ে সুন্দরডুঙ্গা আর বালুনীর সবুজ বুগীয়ালে চলে যায় ভগবান সিং। দিন আর রাতগুলো কাটে নতুন নতুন বৈচিত্র্যের মধ্যে। পাহাড় আর অরণ্য ওর ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে কে জানে। ফিরতে মন চায় না ওর মহামহিম হিমালয়ের শান্ত মৌনী রাজ্য থেকে।

অন্য রাখাল আর আনোয়ালরা ফেরে ওর আগেই। ও ফেরে শীত পড়ার দু এক সপ্তা আগে। মালিকেরা খুব খুশি। বেশি ঘাস খেয়ে তাদের ভেড়া-বকরীর চেহারাই পালটে যায়। দু'গুণ উল পায় ভেড়া-বকরীর।

শীতের সময় অফুরন্ত অবসর। ভগবান সিং গ্রাম ছেড়ে চলে যায় নীচেয় গরুড় আর বাগেশ্বরের দিকে। ওদিকে কাজ পেলে করে, না পেলে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামেও আওয়ারা তাই বিদেশে আওয়ারা হতে ওর শরম লাগে না। ঘর নেই, নেই কোন আত্মীয় পরিজন। কোন টানও নেই লোহারক্ষেতের ওপর।

গরম পড়লে তবে গ্রামে ফেরে। এ সময় মালিকেরা ভেড়া চরাবার কাজ দেয়। ভেড়া নিয়ে চলে যেতে হয় গাঁ ছেড়ে সুদূর হিমালয়ে যেখানে সবুজ ঘাস আছে।

সেবার পাহাড় থেকে আগেই ফিরছিল নীচে। অন্য আনোয়াল-দের আগেই। এ অঞ্চলটা ওর কেন যেন ভাল লাগছিল না। ভেড়ার পাল নিয়ে সুকরাম থেকে সুন্দরডুঙ্গা হয়ে ডুঙ্গিয়াঢণ্ডের মহারণ্যে এসে আশ্রয় নিল ছোট একটা গুহায়। এখানেই আনোয়ালরা সাধারণত রাত কাটায়।

কদিন আগে এখানে রাত কাটিয়ে গেছে দেবীকুণ্ডের তীর্থযাত্রীরা। প্রচুর কাঠ তারা গুহায় রেখে গেছে। কাঠ কুড়োবার ভাবনা নেই। দরকার কিছুটা জলের। পাশের নালাটা শুকিয়ে গেছে। নালায় জল থাকলে আর নীচে নেমে জল আনার প্রয়োজন হতো না।

অরণ্যের ফাঁকামতো জায়গাটায় ভেড়াগুলো ছেড়ে দিয়েছে।

বিরাট তিব্বতী শিকারী কুকুর পাহারা দিচ্ছে ওদের। ভগবান সিং সুন্দরডুঙ্গা নদীতে জল আনতে গেল। জঙ্গলের পথে নদীর দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ভগবান। কাছেই কার যেন কান্নার সুর শোনা যাচ্ছে।

এই নিবিড় অরণ্যলোকে কে কাঁদে? গলাটা মেয়েছেলের বলে মনে হচ্ছে। কোন মেয়ে কি এদিকে এসে পথ ভুলে কাঁদতে বসেছে? তাই বা কেমন করে হয়? এদিকে মেয়ে তো দূরের কথা সাহসী পুরুষও আসতে দ্বিধা করে। গহন অরণ্যের নাগপাশে একবার পথ হারালে নির্ঘাৎ মৃত্যু। অভিজ্ঞ রাখাল আর আনোয়াল ছাড়া এ-পথে কেউই আসে না, আসতে চায় না।

সন্তর্পণে এগিয়ে চলে ভগবান। কান্নার সুর আরো স্পষ্ট। মেয়ের গলা-ই বটে। হঠাৎ চমক ভাঙ্গে—পরী নয় তো!

দুর্গম পাহাড়ে আর নিভৃত অরণ্যলোকে জিন-পরী সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে ঘুরে বেড়ায়। ওরা কখনো হাসে কখনো কাঁদে।

আপাদমস্তক একটা ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল শিরা-উপশিরায়। গা ছম-ছম করে উঠল। পরীর কথা শুনেছে অনেক। সেই ছোট বেলা থেকে শুনছে পরী দেখলে মৃত্যু অবধারিত। ওদের গ্রামের মুকবের সিং পরী দেখার পর পাগলের মতো গ্রামে ফিরে রোজ রোজ ভর হত। তারপর মাত্র তিনদিনের মাথায় ওর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ সামনের খাদে পড়ে থাকতে দেখেছিল গ্রামের সবাই। ভগবানও দেখেছে মুকবের সিংয়ের বীভৎস দেহটা। তারপর কি ভয়টাই না হয়েছিল ভগবানের। রাখালের কাজ নেবার আগে পর্যন্ত ভয়টা ছিল। তারপর ভয় গিয়ে পরী দেখার সাধ বেড়েছে।

পরী দেখার ভয় আর আগ্রহের অদ্ভুত এক ইচ্ছের ভিয়েন চলছিল ওর মনের মধ্যে। ভয় কেটে আগ্রহ বাড়াল। ভাবল মরতে তো হবেই একদিন, না হয় পরী দেখেই মরল। কেমন দেখতে পরীদের?

আরো খানিকটা এগিয়ে খোলা জমি। জমির ওদিকে চোখ দুটো আটকে গেল। বিষম ঝাঁকুনি খেল একটা।

একটা মেয়ে দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পাহাড়ী মেয়ের মতই দেখতে। মাথাভরা চুলের বিনুনী চেটালো পিঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে।

পরীর মুখটা দেখার দারুণ লোভ হচ্ছে। আবার ভয়ও হচ্ছে মুখোমুখি হলে কি হবে কে-জানে। দুপা এগিয়ে গেল ভগবান। ওর পায়ের চাপে শুকনো পাতায় মড়মড় শব্দ হতেই পরী মুখ তুলে ঘুরে দাঁড়াল। আর সেই মুহূর্তে ওর দেহের উষ্ণ রক্তের স্রোত হিম হয়ে গেল। মেয়েদের মতই মুখ। মৃত্যু ওর অবধারিত। পরী কান্না থামিয়ে ওর দিকে খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আবার হাঁউ-মাউ করে কেঁদে উঠল।

ভগবান সিং কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি পরী—জিন?

পরী কান্নাভাঙ্গা স্বরে কি বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভগবান সিংয়ের ওপর।

ভগবান থতমত খেল প্রথম। পালাতে চাইল, কিন্তু পরী ওর কণ্ঠলগ্ন। পরীকে সজোরে ছাড়াতে গিয়ে অবাক হল। পরীর দেহ মানুষের মতই হয়! কেবল একটু বেশি নরম যেন। শুনেছে পরীরা মানুষের মতো আকৃতি নেয় যখন, তখন আর ওদের চেনাই যায় না। কিন্তু পরীর ডানা কই? গুটিয়ে নিয়েছে না-কি? ওরা অনেক ছলাকলা জানে।

পরীর হাত থেকে বাঁচতে হবে। ভগবান সিং যেই জোর করে পরীর হাত দুটো গলা থেকে ছাড়িয়ে দৌড় লাগাতে গেল, নারী কণ্ঠে পরী কেঁদে উঠে বলল, আমি পরী নই, কুমারী!

পরীর গলা শুনে ভগবান আরো অবাক। পরীরা তাহলে মানুষের মতো কথাও বলে? ওর সাহস বাড়ল। পরীকে ভাল করে দেখে নিতে হবে। মরতেই হবে যখন তখন ভাল করে দেখেই মরবে।

—তুমি পরী নও? জিন?

—না না আমি কুমারী।

পরীর উষ্ণ নিঃশ্বাস ভগবান সিংয়ের নাকে মুখে লাগল। দ্রুত

তালে চলা বুকের ধকধকানী শুনল নিজের বুকে। পরীর নরম দেহটা ওর বুকে ঝুলছে। ভগবান সিং কেমন এক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিচিত্র একটা শিহরণ ওর তরতাজা বাইশ বছরের জোয়ান দেহটার শিরা-উপশিরায় উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ল পরীদের ছুঁলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। তারপর মরে অপঘাতে। এমন ভাবেই মরেছিল মুকবের সিং।

জোর করেই গলা ছাড়িয়ে নিল ভগবান।

—আমায় চিনতে পারছ না? আমি কুমারী। হুকুম সিংয়ের মেয়ে। তুমি তো আমাদের গ্রামের অনেকের ভেড়া চরাও। তুমি আনোয়াল। তোমায় আমাদের গ্রামে কতবার দেখেছি।

কাঁদছে পরী ওরফে কুমারী। ভগবান সিং দেখছে পরীকে মানুষের মতো কাঁদতে। ওর তুলতুলে নরম গোলাপী গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। তা হলে কি ও সত্যি পরী নয়?

—তুমি যদি পরী না হও, তাহলে এখানে এলে কেমন করে?

—জাতোলি গাঁও থেকে কাঠ কুড়োতে এসেছিলাম। পথ হারিয়ে ফেলেছি।

—আমায় তুমি চেন?

—খুউব···

—তোমায় তো আমি দেখিনি কখনো?

আবার হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল পরী ওরফে কুমারী। বলল, বিশ্বাস কর আমি পরী নই। হুকুম সিংয়ের মেয়ে আমি। পথ হারিয়ে ফেলেছি।

দিনের আলো নিভে গেছে অনেকক্ষণ। ডুঙ্গিয়াঢণ্ড অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে ঘুমের আয়োজনে ব্যস্ত। গুহায় কাঠের আগুনের পাশে মুখোমুখি বসে খানা পাকাচ্ছে ভগবান সিং আর দেখছে কুমারী। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে ভগবান ওকে নিয়ে এসেছে গুহায়। আশ্রয় দিয়েছে। দুজনে দু'জনকে দেখছে। ভগবান

সিংয়ের সন্দেহ যায়নি তখনো।

কাঠের লালচে আগুনের আলোয় কুমারীর গোলাপী মুখটা টক টকে লাল আপেলের মতো দেখাচ্ছে। ও অবাক হয়ে চেয়ে আছে সে মুখের দিকে। মেয়েদের মুখ যে এতো লাল হয় তা আগে আর কখনো দেখেনি ভগবান সিং।

—তোমার বয়েস কত কুমারী?

—আঠেরো।

—বিয়ে হয়েছে?

—ধ্যাৎ...

—ধ্যাৎ কি? হয়নি তা হলে?

কুমারী লজ্জায় রাঙা। বলল, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

ভগবান বুঝল কুমারী উত্তর দেবে না।

গরম ফাফরের রুটি আর আলুর তরকারী দুজনে ভাগাভাগি করে খেল। তারপর নিজের কম্বল আর বিছানাটাও ছেড়ে দিল কুমারীকে। আগুনের ওধারে কুমারী আর গুহার মুখে আগুনের ধার ঘেঁসে শুয়ে পড়ল ভগবান।

বাইরে খোলা জায়গায় ভেড়া বকরীগুলো ছাড়া আছে। বিরাট কালো লোমশ তিব্বতী কুকুরটা ওদের একাই পাহারা দিচ্ছে। গায়ে দশটা বাঘের ক্ষমতা। দু'তিনটে নেকড়ে বাঘ রুখতে পারে একা। কুকুরটার গলার ঘন্টির টুং-টাং শব্দ নিথর প্রকৃতির বুকে জেগে আছে।

গভীর রাত।

পাহারাদার তিব্বতী কুকুর বিকট গর্জন করে উঠল হঠাৎ।

ঘুম ভেঙ্গে গেল ভগবান সিংয়ের। বাইরে শুকনো ডালপালা আর পাতায় আলোড়ন। ঝাপটা ঝাপটি হচ্ছে।

চমকে উঠে চোখ মেলল ভগবান সিং। দেখল কি একটা কালো লোমশ বস্তু এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ভয়ে ত্রাসে দেহের শিরা-উপশিরায় হিমস্রোত বয়ে গেল।

কালো বস্তুটা আগুন ডিঙিয়ে ভগবানের ওপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'হাতে ঝটকা দিয়ে সরাতে গিয়ে আরো চমকে উঠল। এ-কোন জীব! দেহের কোষে কোষে বিচিত্র এক শিহরণ।

অরণ্যলোকে আলোড়ন তুলে তুমুল লড়াই চলছে বাইরে। তিব্বতী কুকুরটা একটানা ঘর-ঘর-ঘর গর্জন তুলে চলেছে। মাদীকুকুর তাই রাগটা দারুণ। লড়াই করার সময় অমন গর্জন আর ল্যাজের ঝাপটা দেয় কুকুরটা। প্রতিপক্ষ তখন যদি লড়াই-এ পিঠটান দিতে চায়, ওর রাগ চতুর্গুণ বেড়ে যায়। গর্জন শুনে মনে হয় প্রতিপক্ষ কম নয়। তাই মরণপণ লড়ায়ে ব্যস্ত কুকুরটা।

আনোয়াল ভগবান সিংও বাঁচার চেষ্টায় ব্যস্ত। ওর আনোয়াল জীবনের এক মহাসংকট। এমন বিপদে আর বুঝি কখনো পড়েনি।

কালো লোমশ বস্তুটা অক্টোপাসের মতো আকড়ে ধরেছে। তার আকর্ষণের মাদকতায় লড়ায়ের শক্তি নিঃশেষে স্তিমিত। হেরে যাচ্ছে ভগবান সিং তার কালগ্রাসের কাছে। চেতনা সুদূর কোন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে যেন। আর এই অবচেতনার মধ্যে একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ আর শিহরণ ওকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে বারবার। ভগবানকে কি শেষে পরীতেই পেল নাকি?

ভোরের আলো ফুটল।

নিঃসীম অরণ্যলোকের গাছগাছালীর পাতায় পাতায় সকালের সোনালী আলোর রেখা কাঁপছে।

ঘুম ভাঙল ভগবান সিংয়ের। একটা স্বপ্ন থেকেই জেগে উঠল যেন। গুহার আগুন নিভে গেছে। আগুনের ওপারে ভগবানের কম্বলের শয্যা শূন্য। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপরই নিজের পায়ের কাছে একটা চাদর পড়ে থাকতে দেখে চমকালো। এ-চাদরটাই গতকাল দেখেছে পরী ওরফে কুমারীর গায়ে। তাহলে সবটাই স্বপ্ন নয়।

ত্বরিৎ পায়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে হতভম্ব ভগবান সিং। দেখল খোলা মাঠের ওপর বড়সড় একটা চিতাবাঘ চিৎ হয়ে পড়ে

আছে আর তার বুকে বিজয়ীর মতো দুটো থাবা পেতে বসে আছে শিকারী কালো তিব্বতী মাদীকুকুরটা। পাশে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছে কুমারী। ওর গায়ে ভগবান সিংয়ের কালো লোমশ ভোট কম্বলটা জড়ানো!

সকালের সোনালী রোদ কুমারীর গোলাপী মুখে পড়ে আরো গোলাপী। কুমারীর সম্বিৎ ফিরল। তাকাল ভগবানের মুখের দিকে একপলক। তারপরই লজ্জা-রাঙা মুখটা হঠাৎ নামিয়ে নিলো। আর তখনি কুমারীকে যেন ভগবান সিংয়ের পরী বলে মনে হল!

উৎরাই পথ শেষ হয়ে গেছে। পিণ্ডারগঙ্গার সেতু পার হয়ে ঢাকুরির চড়াই পথ ধরেছি প্রায় ঘন্টাখানেক আগে। আর সামান্য চড়াই পথের শেষে ঢাকুরি ডাকবাংলা। ভগবান সিং পিঠে মালের বোঝা নিয়ে মন্থর পায়ে চলেছে আমার পাশে পাশে। ওকে বেশ ক্লান্ত বলে মনে হল।

ঢাকুরির ডাকবাংলায় একটা রাত কাটিয়ে ভোরে বেরিয়ে পড়লাম লোহারক্ষেতের দিকে। লোহারক্ষেতে আজ বিশ্রাম। ওখানেই কাছে ভগবান সিংয়ের ঘর।

পথে ভগবানকে কুমারীর কথা জিজ্ঞাসা করেছি বহুবার। একটাই উত্তর দিয়েছে ভগবান, কুমারী পরী নয়। সত্যিই পথ হারিয়ে ডুঙ্গিয়াঢণ্ডে গিয়ে পড়েছিল। পরদিনই কুমারীকে জাতোলি গ্রামে ওর বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

তারপর কি হয়েছিল তা আর ভগবানের মুখ থেকে বার করতে চেষ্টা করিনি। ভেবেছি, হয়তো ওর কোনো ব্যথা আছে ওই ঘটনার পর, তাই বলতে চায় না।

উৎরাই পথের শেষে এলো লোহারক্ষেত গ্রাম। প্রথম বাড়িটাই ভগবান সিংয়ের। মাথায় টিনের চাল। ঘরের সামনে খানিকটা জমিতে ফসলের বাগান। ভগবান সিং আমায় সাদরে আপ্যায়ন করল বিশ্রাম নিয়ে যাবার জন্য।

সামনের দিকের সাজান-গোছান একটা ঘরে বসলাম। বছর ছয় সাতের একটি ছেলে দরজার কোণে মুখে আঙুল পুরে লাজুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লুকিয়ে পড়ছে। ছেলেটি যেন দেবশিশু।

খানিক বাদে একটি বধূ এলো খাবারের থালা সাজিয়ে। পিছনে ভগবান সিং। থালাটা আমার সামনে রেখে এক টুকরো মিষ্টি হেসে নমস্কার করে দরজার পাশে বসল।

মেয়েটিকে দেখছি। অদ্ভুত সুন্দরী আর নিটোল দেহের গড়ন-পেটন। গোলাপী তুলতুলে মসৃণ মুখ, সুপুষ্টদেহ। চেটালো পিঠের ওপর দিয়ে বিনুনীকরা একঢাল সোনালী চুল লুটিয়ে পড়েছে কাঠের মেঝেয়। ঝাঁকুনি খেলাম একটা।

মেয়েটি আনোয়াল ভগবান সিংয়ের বউ। ছেলেটি একমাত্র সন্তান। ভারি মিশুকে মেয়ে।

অনেক কথা অনেক স্মৃতির জাবর কাটতে কাটতে দিনের আলো পড়ে এলো। সূর্য পশ্চিম আকাশ রাঙিয়ে অস্ত যেতে বসেছে। ওদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ভগবান সিংয়ের পাশে পাশে বধূটিও ঘরের বাইরে আঙিনায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। ওদের চোখেমুখে বিদায়-বেদনার ছাপ। বিকেলের পড়ন্তবেলার রাঙারোদ গোলাপী মুখে যেন আবির মাখিয়ে দিয়েছে। গোলাপীমুখ লাল—টকটকে আপেলের মতো লাল। আজকের মতো ডুঙ্গিয়াঢঙের আর একটা অপরাহ্ণে ও-মুখ বুঝি আরো লাল হয়েছিল। আর সেই অপরাহ্ণটাই ছিল দেবদূত ভগবান সিংয়ের আনোয়াল জীবনের শেষ অপরাহ্ণ!

ভাইসব, তুমি তো শুধু আমার চোখ বাঁচালে না, আমার ঘরও বাঁচিয়েছ।…

কথাগুলো বলতে বলতে ভাবী ঝরঝর করে কাঁদছিল। কাপ-কোটের আধা সরকারী হাসপাতালে সেদিনের রঙ্গমঞ্চে নায়িকা ছিল ভাবী আর দর্শক ছিলাম আমি, ডাঃ অমিয়কুমার হাটি এবং আমাদের অভিযানের পোর্টার-মেট পানসিং ভুটিয়া।

ভাবী কথাগুলো বলেছিল কুমায়ুনের নিজস্ব বুলিতে। শব্দার্থ করে দিয়েছিল মেট পানসিং শুদ্ধ হিন্দীতে। অনুবাদ করেও কিন্তু ক্ষান্ত হয়নি। জীবন-বিচিত্রার রসদের খরিদ্দার আমি তা অল্প দিনেই ও বুঝে নিয়েছিল। আর রসদ যোগান দেবার অফুরন্ত ভাণ্ডার আর উৎসাহ ওর ছিল। ভাবীর অসাক্ষাতে আমায় ভাবীর বিচিত্র জীবনের করুণ কাহিনীর এক অংশ বলেছিল।

ভাবীর কথা বলার আগে একটু গৌরচন্দ্রিকা করে নিই। কারণ ভাবীর কথার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটাও একটা ঘটনা। সেই ঘটনার কথাটা না বললে ভাবীর আবির্ভাব হবে কেমন করে।

কুমায়ুন হিমালয়ের এক দুর্গম পর্বতাঞ্চলে অভিযান শেষ করে ফিরছিলাম। দলের মালবাহকেরা সবাই তাদের গ্রামে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তাব করে। ওদের আমন্ত্রণ বিশেষ করে অভি-যানের ডাক্তারের জন্যই আসছিল।

দুর্গম হিমালয়ে ডাক্তার বদ্যি বা আধুনিক ওষুধ-বিষুধ কিছুই পাওয়া যায় না। অজ পাড়াগাঁয়ে যেমন ডাক্তাররা পশারের অভাবে সচরাচর ডেরা বাঁধেন না, তেমনই গহন হিমালয়ের জনপদে কোনো ডাক্তারই যেতে চান না। হিমালয়ের মানুষ তাই হাতুড়ে গণতুয়া আর জড়িবুটিওয়ালার দাবাই দিয়েই রোগের চিকিৎসা করায়। কালেভদ্রে কোনো অভিযাত্রীদল এলে ওরা ছুটে আসে মাইলের

পর মাইল পথ ভেঙ্গে ওষুধের জন্য। ডাক্তার তাই ওদের সম্মানীয় অতিথি—দেবতা বিশেষ।

আমাদের মালবাহক ওয়াছাম গ্রামের মানুষ জীতরাম ডাক্তার অমিয়কুমার হাটির নিজস্ব মালবাহক অর্থাৎ মেডিকেল-বক্স বাহক। ডাক্তারকে নিজের গ্রামে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক ফাই-ফরমাস খেটেছে। ডাক্তারও ওকে কথা দিয়েছে ওদের গ্রামে যাবে বলে।

আমার কাছে জীতরাম ডাক্তারকে নিয়ে যাবার অনুমতি চাইতেই আমি আপত্তি করেছিলাম। কারণ একবার কোনো মালবাহকের গ্রামে গেলেই অন্যেরা আবেদন জানাবে। সবার গ্রামে যেতে হলে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু অত সময় আমাদের ভাড়ারে মজুত নেই। সবাই সরকারী চাকুরে বাঁধা ছুটিতে পাহাড়ে আসতে হয়েছে। মেয়াদ ফুরোবার আগেই কলকাতা না পেঁাছলে মুশকিল।

অমিয় ব্যস্ত মানুষ। ডাক্তারী পেশা আর রোগীও অনেক তাই আমাদের চেয়ে কলকাতায় ফেরার তাড়া ওর সবচেয়ে বেশি। সেই অমিয় বলল, ফিরতি পথেই জীতরামের গ্রামটা পড়বে বলছে। একবার ঘুরে আসি ওর সঙ্গে, কি বলেন?

মনে মনে আপত্তি থাকলেও মুখে কিছুই বলতে পারলাম না। বাধা দিলে মনক্ষুণ্ণ হবে। বললাম, আমিও যাব।

অমিয় আমার প্রস্তাবে বেশ খুশি হল।

ফেরার পথে জীতরামের গ্রামের বাড়িতে প্রায় নিয়তির টানে এসে পড়লাম। নিয়তি এই জন্য বলব যে আমাদের পদার্পণ একটি নারীসত্তা মর্যাদার আসন ফিরে পাবার প্রতীক্ষায় ছিল।

ছোট্ট পাহাড়ী উপত্যকার একটি গ্রাম ওয়াছাম। শ'খানেক পরিবারের বসতি। প্রচুর চাষের জমি আর অঢেল অরণ্য-সম্পদ সমৃদ্ধ ওয়াছাম গ্রাম। চাষবাস আর পশুপালন ওদের প্রধান জীবিকা। অভিযানের বেশির ভাগ মালবাহক ওই গ্রামেরই মানুষ।

গ্রামে ঢুকেই একটা চিত্র নজরে পড়ল। পথঘাট যেমন নোংরা তেমনই পরিষ্কার তকতকে ঘরবাড়িগুলো। অধিকাংশ পাহাড়ী গ্রামে

কিন্তু এমনটা দেখা যায় না। এখানে আসলে যে যার নিজের ঘরদোর সামলায়। পথঘাট বারোয়ারী তাই দেখার লোক নেই।

পথের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা ঝরনা পার হয়েই জীতরামের বাড়ি। বাড়ির বাইরে এবং ভেতরের উঠোনে অনেকেই জমায়েত হয়েছে। ওদের বেশির ভাগই অসুস্থ। কিছু কৌতূহলী দর্শকও আছে।

জীতরাম ওর তিনটি ছেলেকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল। ছেলেদের পিছনে ওর স্ত্রী গায়ের ওড়নায় একগলা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। অপুষ্টির জন্যে ছেলে তিনটে লিকলিকে রোগা রক্তশূন্য। ডাক্তার একে একে পরীক্ষা করল ওদের। ভিটামিন ট্যাবলেট দিল। উপদেশ দিল ভালমন্দ খাওয়ার।

জীতরাম বউকে দেখিয়ে বলল, সাব মেরী বিবি। লকড়ি কাটতে গিয়ে চোখ জখম হয়েছে। সারবে কি?

—কতদিন হল চোট লেগেছে?

—তা দু' মাস হবে।

ডাক্তার অবাক হয়ে প্রশ্ন করে এতদিন চিকিৎসা করনি কেন?

—গণতুয়া দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি ডগডর সাব। কিন্তু সে বলছে আঁখ বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে। দাবাইতে সারবে না।

হঠাৎ মহিলা মুখের ওপর ঢাকা ওড়না সরিয়ে তাকাল ডাক্তারের দিকে। করুণ দুটো চোখ। কিসের একটা বেদনা যেন উপচে পড়ছে।

ডাক্তার বলল, ভাবী বৈঠিয়ে।

মহিলা বসল সামনে। ডানচোখের দিকে লক্ষ্য করে দেখি সেটা টকটকে লাল। জল ঝরছে। ওই চোখটাই বিলকুল নষ্ট হয়ে গেছে বলছে জীতরাম।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে আমায় বললে, কাঠের টুকরো অথবা অন্য কোনো ফরেন বডি ঢুকে আলসার ফর্ম করেছে। দু' এক দিনের মধ্যে বার না করলে চোখটা সত্যি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

—অপারেশন করে দাও না। বললাম।

—এ্যাপারেটাস থাকলে তো করেই দিতাম।

—তাহলে উপায় কি?

—নিচে নিয়ে গেলে ভাল হাসপাতালে অপারেশন হতে পারে।

এ-অঞ্চলের ভাল হাসপাতাল আলমোড়ায় আছে। ওয়াছাম থেকে আলমোড়ার পথ অনেক। যেতেই দিন চার-পাঁচ লাগবে। তাছাড়া খরচও অনেক। কিন্তু চোখটা বাঁচাতে হলে এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

ডাক্তার আবার ভাবীর চোখ পরীক্ষা করল। চোখের কর্ণিয়ার মধ্যে কি একটা সূক্ষ্ম বস্তু ভাসা-ভাসা দেখা যাচ্ছে। আমায় বলল, জীতরামকে বলুন ওর বউকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। এখনো মাইনর অপারেশনে চোখ বাঁচার চান্স আছে।

জীতরামকে ডাক্তারের উপদেশ বুঝিয়ে বললাম। এখুনি হাসপাতালে না নিয়ে গেলে সত্যি চোখটা নষ্ট হতে পারে।

জীতরাম নীরব। আমার মুখের দিকে খানিক বোকার মতো চেয়ে থেকে বলল, হাসপাতাল তো অনেক দূরে সাহাব। এই বালবাচ্চাদের ফেলে যাই কেমন করে? ঘরে বড় কেউ নেই।

বৃদ্ধ গ্রামপ্রধান জীতরামকে ধমকের সুরে বলল, তোর ঘরে কেউ নেই বলে গ্রামেও কেউ নেই নাকি? আমার ঘরে তোর ছেলেরা থাকবে। তুই বউকে নিয়ে আলমোড়ায় যা।

জীতরাম খুশি হবার বদলে যেন খুব ফাঁপরে পড়ে গেল। আমাদের মুখে বিব্রত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, অনেক টাকা খরচ হবে সাব। আর খরচ করেও যদি চোখ না সারে তাহলে?

—সারবে না তোমায় কে বলেছে জীতরাম? ডাক্তার বলল।

—গ্রামপ্রধান খুবই উত্তেজিত। প্রায় চিৎকার করে আদেশের সুরে বলল, বাহানা ছাড় জীতরাম। আজই সায়েবদের সঙ্গে চলে যা বউকে নিয়ে।

জীতরাম অধৈর্য হয়ে বলে ফেলল, আমি গরীব আদমী, অত টাকা

খরচ করে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সামর্থ্য আমার নেই। চোখ নষ্ট হলে আমি কি করব? বিনা চিকিৎসায় আমাদের অনেকেই মরে। কে আর আলমোড়ায় দাবাই আনতে যায়? এটা আমাদের নসীব।

জীতরামের কথা শুনে মাথাটা গরম হয়ে গেল। বললাম, তাই যদি বুঝে থাক তাহলে আমাদের নিয়ে এলে কেন?

—ভেবেছিলাম দাবাই দিলে ঠিক হয়ে যাবে।

ভাবীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক। দু' চোখে অশ্রু ঝরছে। অশ্রুঝরা চোখে একটা বোবা আকুতি স্পষ্ট। সে আকুতি বুঝি চোখটা ফিরে পাবার।

ভাবীকে বললাম, তোমার অপারেশনের সব খরচ আমরা দেব, যাবে আমাদের সঙ্গে?

ভাবী খুশি হয়ে জীতরামের মুখের দিকে তাকাল সম্মতির আশায়। জীতরাম নির্বাক।

গাইড পানসিং জীতরামকে নির্দেশ দিল, মালপত্র নিয়ে আজ গ্রামে থেকে যাবার। কাল ভোরে বউকে নিয়ে সিধে যেন আমাদের সঙ্গে লোহারক্ষেতে মেলে। ওখান থেকে সবাই একসঙ্গে কাপকোটে যাব।

জীতরাম যেন একদলা কুইনাইনের বিস্বাদ বড়ি গলাধঃকরণ করে মাথা নাড়ল, তাই হবে।

ওয়াছাম থেকে সেদিন বেরিয়ে ঢাকুরিতে রাত কাটিয়েছি। পরদিন লোহারক্ষেতে জীতরাম ভাবীকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে মিলেছে। তার পর দিন আমরা সবাই কাপকোটে পৌঁছলাম।

কাপকোটে এসে জানলাম যে ওখানে একটা হাসপাতাল আছে ডাকবাংলার কাছে। চারটে বেড আছে। ডাক্তার একজন। দু' জন কম্পাউনডার আর দুজন নার্সও আছে। সপ্তাহে সপ্তাহে আলমোড়া থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আসেন রোগী দেখতে। বিশেষ প্রয়োজনে ফোনে আলমোড়া থেকে সার্জেনও ডাকা হয়। কাপকোট হাসপাতালের বর্তমান ডাক্তার এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

ভাবীকে নিয়ে ডাক্তার এবং আমি হাসপাতালে গেলাম। আলাপ করলাম লক্ষ্ণৌর প্রবাসী বাঙ্গালী ডাঃ হাজরার সঙ্গে। একটি প্রাণবন্ত চমৎকার যুবক ডাঃ হাজরা। ভাবীর চোখের ব্যাপারটা অমিয় জানাল ডাঃ হাজরাকে। তারপর দু'জনে আবার পরীক্ষা করে এক্ষুণি অপারেশন করা দরকার বলে মত প্রকাশ করলেন।

—আজ অপারেশন হবে? জিজ্ঞাসা করলাম।

ডাঃ হাজরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে খানিক ভেবে নিয়ে বললেন, আলমোড়ায় গেলে ভাল হত। ওখানে অফ্‌থ্যালমিক সার্জেন ডাঃ অনুপ সিং আছেন। ওঁর হাতে অপারেশন হলে ভালই হয়।

আলমোড়ার নাম শুনে চিন্তায় পড়লাম। এখান থেকে আলমোড়া দু'দিনের পথ। তারপর সেখানেও দু'এক দিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। ছুটি ফুরিয়ে আসছে তাড়াতাড়ি না ফিরলে নানা সমস্যা।

—ডাঃ সিংকে এখানে আনা যায় না? আমাদের ছুটির সমস্যা বুঝতেই পারছেন।

- ওদের বরং আলমোড়ায় পাঠিয়ে দিন না।

ডাঃ হাজরাকে জীতরামের অনীহার কথা বলায় উনি একটু অবাক হলেন তারপরই টেলিফোন তুলে আলমোড়া চাইলেন। ডাঃ অনুপ সিং-এর সঙ্গে ফোনে কথা বলে জানালেন, ডাঃ সিং রাজি হয়েছেন। কালই এসে পৌঁছবেন।

পরদিন দুপুরে যথারীতি ডাঃ অনুপ সিং আলমোড়া থেকে সোজা জিপে কাপকোট এসে পৌঁছলেন। ডাঃ হাজরা, অমিয় এবং আমার সঙ্গে ডাঃ সিং-এর আলাপ করিয়ে দিলেন। ভাবীর অসুখ এবং কি করে সুদূর ওয়াছাম গ্রাম থেকে এখানে এসেছি তা সবই বললাম ওঁকে।

ডাঃ অনুপ সিং ভাবীকে পরীক্ষা করে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন এবং সাফল্যের সঙ্গে ভাবীর চোখে অস্ত্রোপচার করে কাঠের একটা টুকরো বার করে দিলেন।

অপারেশন থিয়েটার থেকে বাইরে বিশ্রাম কক্ষে বসে ডাঃ সিং বললেন, খুব সময়ে নিয়ে এসেছেন। আর ক'দিন দেরি হলে চোখটা

নষ্ট হয়ে যেত।

—আপনি এতদূর কষ্ট করে এলেন বলেই চোখটা বাঁচল।

আমার কথায় বাধা দিয়ে উনি বারবার ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন। হিমালয়ের একটা সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের এই আগ্রহ ওঁকে নাকি চমৎকৃত করেছে। ডাঃ সিং কুমায়ুনের মানুষ। ডাঃ হাজরার টেলিফোন পেয়ে একটা বিশেষ অপারেশন স্থগিত রেখেই উনি কাপকোটে চলে এসেছেন নিজের জিপ নিয়ে।

ডাঃ অনুপ সিং আর ডাঃ হাজরাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখি চোখে পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ভাবী। কিছুটা দূরে একটা গাছের ছায়ায় জীতরাম কেমন যেন নিঃসঙ্গ বিমর্ষ।

ভাবীর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কেমন লাগছে ভাবীজী? ভাল তো?

হিমালয় কন্যা গ্রাম্য বধূ ভাবী পরিবেশ ভুলে আমার হাতটা চেপে ধরে অঝোরে কেঁদে ফেলল। কান্নাঝরা গলায় বলল, ভাইসাব, তুমি তো আমার চোখ বাঁচালে না, আমার ঘরও বাঁচিয়েছ।

আমি বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছি ভাবীর দিকে। ভাবী নিজের ভাষায় অনেক কথা বলে গেল তারপর, যার এক মর্মও বুঝতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে মেট পানসিং এবং অন্যান্য মালবাহকরা আমাদের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ওরা সবাই উত্তপ্ত। জীতরামকে উদ্দেশ্য করে নানা অশ্রাব্য কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে। ভাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বাংলোয় পাঠালাম।

মেট পানসিংকে পাশে ডেকে নিয়ে ভাবী কি বলল জিজ্ঞাসা করায় যে কাহিনী শুনলাম তা যেমনই বিচিত্র তেমনই মর্মস্পর্শী।

…জীতরাম বউ-এর ওপর কোনো দিনই নাকি সদয় নয়। গরীব জন-মজুরের মেয়ে গঙ্গাদেবীর বাপের সামান্য জমিও ছিল না। বিয়ে করার পর থেকে জীতরাম গঙ্গাদেবীকে তাই হেনস্থাই করে এসেছে।

কথায় কথায় জীতরাম জ্ঞাতিভাই-এর বউ-এর প্রশংসা করত। কারণ সেই বউ বাপের অনেক সম্পত্তি নিয়ে ভায়ের ঘরে এসেছিল।

জ্ঞাতিভাই এক দুর্ঘটনায় হঠাৎ মারা যাবার পর জীতরামের মতি-গতি কেমন যেন সন্দেহ হত গঙ্গাদেবীর। ভায়ের বিধবার দেখাশোনার নামে রোজই যেত সেখানে। মাঝে মাঝে রাত কাটাত নানা অছিলায়।

কাঠ কাটতে গিয়ে যেদিন গঙ্গাদেবীর চোখে আঘাত লাগে সেদিন থেকেই জীতরাম কেমন যেন খুশি। গঙ্গাদেবী প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। কিন্তু জীতরাম যখন কোনো ডাক্তার বদ্যি দেখাবার ব্যবস্থা করতে আপত্তি করে তখনই গঙ্গাদেবীর সন্দেহ হয়। ওদিকে জীতরাম ঘন ঘন জ্ঞাতিভাইয়ের বিধবা বউয়ের কাছে যাতায়াত শুরু করায় সন্দেহটা পাকাপোক্ত হয়।

গঙ্গাদেবী শেষে গণতুয়ার কাছে যায় ওষুধের জন্য। গণতুয়াও হার মানে। সবাই ওকে কাপকোটে ডাক্তারের কাছে যাবার পরামর্শ দেয়। জীতরাম নানা অছিলায় এড়িয়ে যায় গঙ্গাদেবীর সব অনুরোধ।

অবশেষে গঙ্গাদেবী গোপনে গ্রাম প্রধানের সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলে। বিশেষ করে জীতরামের বিধবা ভায়ের বউ সম্বন্ধে।

ওদের সমাজে বড় ভায়ের বিধবা বউকে বিয়ে করা চলে। জীত-রামের মতলবও তাই। তবে বউ বর্তমান থাকলে ভায়ের বিধবা বউকে বিয়ে করা সমাজ বিরুদ্ধ। অবশ্য অসুস্থ কিংবা অঙ্গহানীর দোষ যদি কোন বউ-এর থাকে তাহলে সামান্য জরিমানা দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার হয়।

জীতরাম ধরেই নিয়েছিল বউ-এর চোখ নিশ্চয় নষ্ট হয়ে যাবে। যখন আর সারার কোন উপায়ই থাকবে না তখন ডাক্তার দেখিয়ে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিলেই গঙ্গাকে বিচ্ছেদ করা সহজ হবে। গঙ্গাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারলে বিধবা ভাবীকে বিয়ে করে সুখী হবে। ভাবীও জীতরামকে খুবই পছন্দ করে। জমিজমাও আছে তার অনেক। জীতরামের জমিজমার ওপর দারুণ লোভ। তাছাড়া ভাবীর ভরন্ত যৌবনের আকর্ষণ তো আছেই।

গ্রামের লোক জীতরামকে আর ওর বিধবা ভাবীকে সন্দেহের চোখে দেখত আগে থেকেই। গঙ্গার কাছে শোনার পর গ্রামপ্রধান দুজনকেই ডেকে শাসিয়েছে। শাসানীর পর অবশ্য জীতরাম আর ভাবীর ঘরে রাত কাটায় নি। তবে দিনে দুপুরে যাতায়াতটা ঠিকই রেখেছে। এতে সমাজ শাসন করতে পারে না।

আমাদের অভিযানে আসার উদ্দেশ্য নাকি ডাক্তারের একটা সার্টি-ফিকেট যোগাড় করে গঙ্গার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ পাকা করার মতলব। ডাক্তারের নির্দেশ আর আমার আগ্রহ যে ওর বিরুদ্ধে যাবে তা নাকি ও একেবারেই ভাবেনি। জানলে আমাদের গ্রামে ডেকে আনত না।

ভাবী আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ শুধু ওর চোখ বাঁচানোর জন্য নয়, চোখের সঙ্গে ওর ঘরও বেঁচেছে। চোখ নষ্ট হলে সামান্য জরিমানা দিয়ে ভাবীকে বিদেয় করে জ্ঞাতিভায়ের বিধবাকে বিয়ে করে ঘরে তুলত জীতরাম।···

হিমালয় থেকে বিদায় নেবার সময় হয়ে গেছে। সবাই বাসে উঠে পড়েছি। মালবাহকরা বাইরে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছে। অনেকেরই চোখ লাল।

ভিড়ের মধ্যে একটা মুখ খুঁজছি। দেখিনা সে মুখ। অবাক হই। বাজারের এ মাথা থেকে সে মাথায় চোখ বুলিয়ে হঠাৎ একটা গাছের ছায়ায় দেখলাম জীতরাম আর ভাবী দাঁড়িয়ে।

ভাবী তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ওর একটা চোখে পুরু ব্যাণ্ডেজ আর একটা চোখ ছাপিয়ে মসৃণ গাল বেয়ে মুক্তোর মতো অশ্রু ঝরছে। ভাবীর পাশেই জীতরাম। ওর চোখ দুটোও জলে ভাসছে!

ভাবীর চোখ ফিরেছে, জীতরামের চোখ খুলেছে।

তিন বছর আগের দেখা বউরাণীকে যে ওই অবস্থায় দেখব তা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনোদিন।

উনিশ-শ' উনোসত্তর সালের সুন্দরডুঙ্গা অভিযানে ঢাকুরি থেকে জাতোলি গ্রামে যাবার সময় পথশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ছোট একটা নাম-না-জানা গ্রামে বিশ্রামের জন্য বসেছিলাম। যেখানে বসেছিলাম ঠিক তার সামনের বাড়ির দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছিল একটি মেয়ে। বাড়ির সামনে আমাদের বসতে দেখে অপলক তাকিয়েছিল মেয়েটি। তার চোখে বিস্ময় আর কৌতূহল ছিল।

মেয়েটির বিস্ময় আর কৌতূহল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মেয়েটি বছর বাইশ-তেইশএর নিটোল তন্বী যুবতী। দেহের ভাঁজে ভাঁজে উদ্ভিন্ন যৌবন মোটা কম্বলের জামার নিষ্ঠুর শাসনকে ফাঁকি দিয়ে প্রস্ফুটিতপ্রায়।

আমরা তৃষ্ণার্ত। মেয়েটি জল এনে দিয়েছিল পাত্র ভরে। শেষে জমির ফসল কাঁকড়ি অর্থাৎ মোটা শশা লুকিয়ে দিয়েছিল আমাদের। আর তার ফল মেয়েটিকে পেতে হয়েছিল হাতেনাতে। এক বৃদ্ধা আমাদের আয়েস করে কাঁকড়ি খেতে দেখে প্রথমে থ'। তারপর ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে মেয়েটিকে এই মারে তো সেই মারে।

বৃদ্ধার লম্ফ-ঝম্প দেখে আমরাও হতবুদ্ধি। কি কারণে হতে পারে? পরে জেনেছিলাম বৃদ্ধাকে না জানিয়ে কাঁকড়ি দিয়েছে বলে এই রাগ। কাঁকড়ির দাম আমরা দিতে চেয়েছিলাম। তাতে আবার বৃদ্ধার আত্মসম্মানে লেগেছিল। বলেছিল, একটা তো মাত্র কাঁকড়ি। ওর আবার দাম কি? দাম দিতে হবে না।

—মেয়েটিকে তাহলে বকাঝকা করলে কেন দাদী?

বৃদ্ধা মেয়েটির দিকে এক ঝলক তপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলেছিল, ঘরের বউ, আমি শাশুড়ি বাড়ির মালকিন, আমায় না জিজ্ঞেস করে

কাঁকড়ি দেয় কোন আক্কেলে? কড়া করে ধমকে দিলাম আর যেন এই অনাছিষ্টির কাজ কখনো না করে।

মেয়েটির গোলাপী মুখ সেই মুহূর্তে টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল লজ্জায়।

সেদিনের সেই মেয়েটিই বউরাণী। ওর আসল নাম কি তা আজও জানি না। বউরাণী নামটা আমাদেরই দেওয়া।

বউরাণীর চেহারা দেখে প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চাইনি। এ নিশ্চয় অন্য কোনো বধূ। কারণ আমার চেনা সেই গোলাপী আর লালচে রং-এর তন্বী যুবতী যে এ হতেই পারে না। অপরিচ্ছন্ন খাটিয়ায় মিশে যাওয়া যে মেয়েটি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে সে আর যেই হোক—বউরাণী নয়।

স্মৃতির সূক্ষ্ম সূতো ধরে নাড়াচাড়া করেও তিন বছর আগের দেখা বউরাণীর সেই চেনা মুখের সঙ্গে এ-মুখের আদল খুঁজে না পেয়ে কেমন যেন মুষড়ে পড়লাম। আজও স্পষ্ট মনে আছে বউরাণীর স্নিগ্ধ চোখ দুটো। যে চোখে অনাবিল বিস্ময় মাখা সরল কৌতূহল চিকমিক করেছিল ওই দিনটায়।

আমরা সেদিন যখন বিদায় নিয়ে জাতোলির পথে এগিয়ে যাচ্ছি তখন বউরাণী হাতের কাজ ফেলে শাশুড়ির ধমক ভুলে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। দূর থেকে বউরাণীর চোখের পাতা ভিজে দেখেছিলাম।

কিন্তু আজকের রুগ্না মেয়েটির সে চোখই নেই। ভাবলেশশূন্য চোখ দুটোয় বিস্ময়-কৌতূহলের বদলে বোবা চাউনি একটা।

সেদিন যে গাইড সঙ্গে ছিল আজও সে-ই আছে সঙ্গে। তাকেই অবশেষে জিজ্ঞেস করলাম, এই কি সেই বউরাণী?

—জী সাহাব। বেদনাভরা অথচ গম্ভীর জবাব দিল গাইড। টি-বি'তে এই হালত করে দিয়েছে বহিনজীর।

খাটের দিকে এগিয়ে যেতেই মেয়েটি আমার দিকে তাকাল। সেই একই বোবা চাউনি।

—আমায় চিনতে পার বহিনজী ?

মেয়েটি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল আমার চোখে। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়িয়ে জানান দিল চেনে না।

না-চেনাটা অস্বাভাবিক নয়। এক দিনের ক্ষণিক দেখা পদযাত্রীর কথা তিন বছর বাদে কেই বা স্মরণে রাখে। তবে এ-মেয়ে সেই মেয়ে হলে কাঁকড়ির কথা নিশ্চয় ভুলবে না।

কাঁকড়ির ব্যাপারটা সব বললাম। এবং অবাক হলাম দেখে মেয়েটির বোবা চাউনির ঘোর কেটে কৌতূহলের চাপা অদল-বদল হচ্ছে চোখে-মুখে।

—মনে পড়ছে তোমার শাশুড়ির কথা ? কি রকম চটে গিয়েছিল আমাদের কাঁকড়ি দিয়েছিলে বলে।

হালকা হাসির একটা রেখা খেলে গেল ওর চোখে আর ঠোঁটে। তারপর মাথা হেলিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, মনে পড়ছে।

একটা ব্যথা বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। কামনা করছিলাম যেন মনে করতে না পারে। কারণ আমার মানসলোকের বউরাণীকে মৃত্যু-শয্যায় দেখার মতো মানসিক জোর আমার নেই। তবু যা বাস্তব তা ঘটবেই। এবং দুঃখের সঙ্গে যক্ষারোগগ্রস্ত মেয়েটিই যে বউরাণী সেই নিষ্ঠুর সত্যকে মেনে নিতে হল।

বউরাণীর মাথার কাছে এক শক্ত-সমর্থ যুবককে অবাক হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে দেখলাম। এতক্ষণ আমরা এতো বিহ্বল হয়েছিলাম যে, যুবকটির দিকে নজরই পড়েনি। ও নিশ্চয় এ-বাড়ির কেউ। সাধারণ ভদ্রতার খাতিরে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি ভাই ?

মিষ্টি হেসে যুবকটি বললে, মোহন সিং।

গাইডেরও যেন এতক্ষণে খেয়াল হল। বলল, মোহন বউরাণীর মরদ।

হঠাৎ মনে পড়ল বউরাণীর মরদ তো সৈন্য বিভাগে কাজ করত। সেবার ছিল না বাড়িতে।

—ছুটিতে এসেছ ? জিজ্ঞাসা করলাম।

—না চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। সর্ট সারভিস্-এ ছিলাম। মেয়াদ ফুরোতেই পেনশান নিয়ে চলে এসেছি।

আমার ডাক্তার বন্ধু ইতিমধ্যে রোগিণীকে পরীক্ষা করে একটা ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছে। রোগিণীর বোবা চাউনিও খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

—কি রকম বুঝছেন ডাক্তার সাব ? মোহন সিং উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করল ডাক্তারকে।

—ভাল হয়ে যাবে। চিন্তা করো না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল এরা তো আর অ্যালোপ্যাথি ড্রাগ পায় না তাই ইনজেকশন খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে।

ডাক্তার মোহন সিংকে কিছু গরম দুধ খাইয়ে দিতে বলল। ইনজেকশনের ধকল সামলাবার জন্য পথ্য দরকার। মোহন সিং জানাল যে বউরাণী কিছুই খেতে চায় না। আর না খেয়ে খেয়ে ওর এই অবস্থা।

ডাক্তারের কথামতো দুধ আনতে গেল মোহন সিং। আমি খাটিয়ার এক কোণে বসে বউরাণীর শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগছে এখন ?

—ভাল। ছোট্ট জবাব কিন্তু স্পষ্ট।

—খেতে চাওনা কেন ? না খেলে যে দুর্বল হয়ে পড়বে বহিনজী।

বউরাণী বড় বড় করে তাকাল আমার মুখে। চোখ দুটো মুহূর্তে সজল হয়ে এলো। বলল, খেতে ইচ্ছে করেনা সাব।

—ইচ্ছে না করলেও যে খেতে হবে ভাই। তোমার জন্য মোহন পেনশান নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে, আর তুমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাক তা'হলে ওর কি হবে ?

বউরাণীর রুগ্ন ক্ষীণ দেহটায় সামান্য চাঞ্চল্য জাগল। আর ঠিক তখনি মোহন সিং একটা পাত্রে গরম দুধ নিয়ে এলো। ক'টি গ্ল্যাকসো বিস্কুট বার করে দুধের পাত্রটা নিয়ে ধরলাম বউরাণীর মুখে। বিনা আপত্তিতে বউরাণী দুধের পাত্রে চুমুক দিল। ধীরে ধীরে বিস্কুট কটাও খাইয়ে দিলাম। হঠাৎ নজর পড়ল মোহনের দিকে। ওর চোখে বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতার মেশামেশি।

ক'দিন শত চেষ্টা করেও মোহন সিং নাকি ওর বউকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। তাই আমার হাত থেকে বউকে দুধ আর বিস্কুট খেতে দেখে বিস্মিত আর আনন্দিত।

নানা কথা নানা আলোচনার পর জানলাম বউরাণীর শাশুড়ি নাকি সে বছরই হঠাৎ মারা গেছে। সংসারে শাশুড়ি আর স্বামী মোহন ছাড়া অন্য কেউ ছিল না আপন জন। মোহন সে সময় নিজের ইউনিটে ঘুরছিল সীমান্তে। শাশুড়ি মারা যাওয়ায় চোখে অন্ধকার দেখল বউরাণী। শেষে গ্রামের মোড়লের উপদেশমতো তার পাঠিয়েছিল স্বামীর কাছে। ক'দিন বাদেই মোহন সিং গ্রামে ফিরে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল বউরাণী।

মা নেই। ঘরে যুবতী বউকে একা রেখে চাকরিতে ফিরে যাওয়া এক সমস্যা। তাছাড়া জমিজমা আর ভেড়া-বকরী গরু-মেষ দেখা-শোনা করে কে। শেষে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে চাকরি থেকে রেহাই চাইল ইউনিট কম্যাণ্ডারের কাছে। কপাল ভাল ওর। সর্ট সারভিসে যোগ দিয়েছিল এবং তার মেয়াদও ফুরিয়েছিল ততোদিনে। তাই সহজে সামান্য পেনশনে অব্যাহতি পেল মোহন সিং।

স্বামীকে নিবিড় করে কাছে পাবার আনন্দে যখন বিভোর তখন কিন্তু ভাগ্যদেবতা তাঁর কলকাঠি নেড়েই চলেছেন। সুখস্বপ্নে বিভোর বউরাণী একদিন আবিষ্কার করল কফের সঙ্গে তাজা রক্ত। প্রথমটায় বলেনি। ভেবেছিল গলা চিরে রক্ত ঝরেছে। কিন্তু শরীর নিদারুণ দুর্বল। পায়ে জোর নেই, কাজে মন নেই আর নেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা।

মোহনের চোখে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলে কি হবে, মোহন বুঝতে

পারছিল কি এক রোগে ধরেছে বউরাণীকে। একদিন প্রচণ্ড কাশির ধমকে রক্ত উঠল ঝলকে ঝলকে। ধরা পড়ে গেল মোহনের কাছে।

বউরাণীর ভয় এবার বুঝি মোহন ওকে বিদায় করবে। যক্ষারোগ-ক্রান্তা স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ অতি সহজেই করা যায়। আর তাই যদি করে মোহনকে দোষ দেবার কেউ নেই। ওদের পাহাড়ে যুগ যুগান্ত ধরে এ ব্যবস্থা চলে আসছে। মোহন আবার বিয়ে করে সংসার পাতবে, সুখী হবে। কিন্তু বউরাণীর কি হবে? গাঁয়ে বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেউ নেই। পর অন্নে তার দিন চলে। ব্যামো হলে জল দেবার লোক নেই। সেই মায়ের কাছে গিয়ে উঠবে বউরাণী? অসম্ভব।

যক্ষ্মারোগ হলে মানুষ বাঁচে না এ বিশ্বাস পাহাড়ী মানুষের। শুনেছে শহরে ডাক্তার আর ওষুধ আছে। ওষুধ ঠিকমতো পড়লে নাকি এ-রোগও আজকাল সারে। কিন্তু এই দুর্গম পাহাড়ে ডাক্তার আর দাবাই পাবে কোথায়। সুতরাং যতো তাড়াতাড়ি মারা যায় ততোই শান্তি। এ বুদ্ধি মাথায় আসার পর অত্যাচার বাড়িয়ে দিয়েছিল বউরাণী। স্বামীর কোনো অনুরোধই রাখেনি।

যত দিন গেছে ততোই বউরাণীর শরীরের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। শেষে শয্যা আশ্রয় করে বাঁচার এক প্রচণ্ড ইচ্ছায় অস্থির হয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা ওই গ্রামে গিয়ে পড়েছি।

ডাক্তারের দাবাই আর ইনজেকশন বেশ কাজ করেছে। ডাক্তার বন্ধু আমায় বলল, এখানে একজন ডাক্তার অথবা কম্পাউণ্ডার পাওয়া গেলে ভাল হত। দু' সপ্তা ইনজেকশন নিয়মিত দিতে পারলে এ যাত্রায় বাঁচবে।

—ইনজেকশন ছাড়া ওষুধ-ক্যাপসুলে কাজ হবে না?

—হবে, তবে সময় লাগবে। অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।

ডাক্তার তার সামান্য ভাণ্ডার ঘেঁটে যা ওষুধ পেল তা সব বুঝিয়ে দিল মোহন সিংকে। কখন ক'বার কোন ওষুধ খাবে। তারপর আমায় বলল, কলকাতায় গিয়ে কিছু ওষুধ পাঠাতে পারবেন ডাকে?

—নিশ্চয়। জবাব দিলাম।

বিকালে বউরাণী আর মোহন সিংয়ের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলাম। চলে এলাম নিভৃত হিমালয়ের এক রাজ্য থেকে কোলাহলমুখর শহর জীবনে।

যেদিন কলকাতায় ফিরলাম সেদিনই বিকেলে টিবি-র অনেক ওষুধ কিনে দিয়ে গেল আমার ডাক্তার বন্ধু। সঙ্গে ব্যবহার করার নির্দেশও।

ওষুধের পার্শেল প্যাকেট ডাকে পাঠাবার আগে বউরাণীর ঠিকানাটা আর একবার চোখ বোলাতে গিয়ে দৃষ্টি আমার কেমন ঝাপসা হয়ে গেল। আর সেই ঝাপসা দৃষ্টির মধ্যে দেখলাম ঘুপচি আধা অন্ধকার ঘরের এক চারপাইতে বউরাণীর ফ্যাকাশে শাদা দেহটা মিশিয়ে আছে। শাদা মুখের মধ্যে কেবল চোখ দু'টোয় যত উজ্জ্বলতা। বউরাণী চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল তারপর তাকাল মোহন সিংয়ের দিকে। শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে আমার হাত ধরে বলল, ভাইসাব আমি ভাল হয়ে যাব তো? আমি ভাল না হলে ওকে দেখবে কে? আমায় ভাল করে দাও ভাইসাব।

বউরাণীর চোখ বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ছে। হিমালয়ের এক অসহায় বধূ যে একদিন মৃত্যুকেই কামনা করেছিল আজ সে বাঁচতে চাইছে। ওর অশ্রু সেই বাঁচার আকুতিকে বেদনামধুর করে তুলেছে।

ঝাপসা চোখের কোল বেয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু আমার কখন যেন সেই ওষুধের পার্শেলের ওপর পড়েছে খেয়াল করিনি।

ডাক বাবুর হাতে পার্শেলটা গছিয়ে দেবার সময় আমার দূরাগত সেই হিমালয় কন্যা রুগ্না বোন বউরাণীর রোগমুক্তি আর দীর্ঘ জীবন কামনা করলাম।

সারাদিন হাঁটছি আর হাঁটছি। হাঁটছি সবাই এক সাথে। দলছাড়া হলে বিপদ। একবার দলছুট হলে অরণ্যের নাগপাশে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

অরণ্যের একটুকরো ফাঁকা জায়গা দেখে বসলাম সবাই। এখানে দুপুরের খাওয়া আর বিশ্রাম হবে। মালবাহকের দল আশে-পাশে গাছের আড়ালে বসে গেছে। ওরা পারতপক্ষে আমাদের সামনে খায় না। খাওয়ার সময় তাই আড়ালে সরে যায়। দু একজন অবশ্য ব্যতিক্রম।

দ্বিপ্রাহরিক আহারপর্ব সেরে মোটা মোটা আদিম বনস্পতির গায়ে ঠেসান দিয়ে চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছি। বিশ্রামের অবসরে নানা ভাবনা মনের কোণে ঘোরাফেরা করে। দুর্গম পথ, কঠিন অভিযান। ভাবনা তাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি আর কান্নার শব্দে চমক ভাঙল। উঠে বসলাম। আশপাশ থেকে মালবাহকরা চিৎকারের উৎসের দিকে দৌড়ল।

অনেকগুলো কণ্ঠের শোরগোল। ব্যাপার কি! এখানে কি এমন ঘটতে পারে মাথায় এলো না। উঠলাম। এগিয়ে গেলাম গোলমাল যেদিকে হচ্ছে।

আমাদের চলার পথের বেশ কিছুটা আগে এক জায়গায় ভিড়। সামনের দিকে এগিয়ে দেখি আমাদের মালবাহক দেওয়ান সিং প্রচণ্ড রাগে লম্ফঝম্প করছে। জনাদুয়েক মালবাহক দলের কনিষ্ঠতম মালবাহক প্রিতম সিংকে আগলে রেখেছে। অন্য মালবাহকরা সামলাচ্ছে দেওয়ান সিংকে।

দেওয়ান সিংয়ের চোখ দুটো রাগে রক্তবর্ণ, কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুলগুলো উসকোখুসকো। হাড্ডিসার পাকানো দেহের নীল নীল শিরা-উপশিরায় দ্রুত রক্তচলাচল যেন স্পষ্ট। পিছনে বড় একটা

পাথরের ওপর কয়েক টুকরো ছেঁড়া রুটি পড়ে আছে।

—ক্যা হুয়া ?

আমায় দেখে দেওয়ান সিং চমকে উঠল প্রথম। তারপর প্রিতম সিংয়ের প্রতি এক ঝলক রাগের উত্তাপ ছড়িয়ে অভিযোগ করল, সাব, ওই শয়তান লেড়কা আমার রোটি চুরি করে সাফ করেছে। আগেভাগে নিজের খানা খেয়ে নেয় তারপর আমারটা হাতায়। রোজ চুরি করে। আজ ধরেছি হাতেনাতে।

প্রিতমের দিকে তাকিয়ে দেখি মারের যন্ত্রণার চেয়ে কিসের একটা লজ্জা আর বিস্ময় ওর মুখে।

—কিরে, ওর খানা চুরি করেছিস ?

প্রিতম একবার আমার মুখে আর একবার দেওয়ান সিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করল। তারপর বলল, নহী সাব। চাচা আমায় ডেকে খানা দিয়েছে।

দেওয়ান সিং যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল, ঝুট মত বোল্ শালা। আমার দিকে চেয়ে বলল, নিজের ক্ষিদের জ্বালায় মরি সাব, ওকে আমি যেচে রোটি দিতে যাব ? কেন, ও আমার কে ? চুরি ধরা পড়ে গেছে কিনা তাই এখন সন্ত সাজছে।

মালবাহকদের মধ্যে একজন প্রতিবাদ করল। বলল, ওয়াছামের লেড়কা ঝুট বলে না চুরি করে না। তুমি ঝুট বাত বলছ।

অন্য মালবাহকরা প্রতিবাদের সুরে সুর মেলাল।

ব্যাপারটা কেমন খটমট লাগল। এদের বিবাদও ভাল লাগছে না। সামান্য ব্যাপার থেকে হিমালয়ে অনেক সময় গুরুতর পরিস্থিতির কথা অনেক শুনেছি। সূচনায় এ ঝঞ্ঝাটের মূলোচ্ছেদ করতে না পারলে ভবিষ্যতে অভিযান কঠিন সমস্যায় পড়তে পারে।

প্রথমেই দেওয়ান সিংকে ধমক লাগালাম বাচ্চা ছেলেটাকে মারার জন্য। তারপর প্রিতমকে সাবধান করলাম। মেটকে বললাম, প্রিতমকে আরো বেশি রেশন দেবার জন্য।

সাময়িক মিটল বটে সেদিনের ঝঞ্ঝাট। কিন্তু একটা স্পষ্ট অসন্তোষ ধূমায়িত হতেই থাকল সবার মধ্যে। দেওয়ান সিংকে কেউই সহ্য করতে পারে না। দেওয়ানও কেমন যেন মনমরা হয়ে আলাদা হয়ে পড়ল দল থেকে।

দলের মালবাহকরা শুধু সেদিনের ঘটনা থেকেই দেওয়ানের ওপর বিরূপ নয়। আসলে ওরা কেউই চায়নি যে দেওয়ানের মতো অচেনা একটা লোক ওদের সঙ্গে যাক।

কাপকোটে প্রথম যেদিন আমরা গিয়ে পৌঁছই সেদিন দেওয়ান সিং নিজের এগিয়ে এসে বাসের মাথা থেকে আমাদের মালপত্র নামিয়েছে। ডাকবাংলোয় থাকার ব্যবস্থাটাও দেওয়ান করেছে। কাপকোটের প্রায় সবাই চেনে ওকে।

এ অঞ্চলে মালবাহকের খুবই অভাব। মোটা টাকা দিয়েও ভাল মালবাহক পাওয়া যায় না। তোষামোদ করে মালবাহক সংগ্রহ করতে হচ্ছিল।

যাত্রার দিন সকালে দেওয়ান সিং তার আরজি পেশ করল। আমাদের সঙ্গে মালবাহক হয়ে যাবে অভিযানে। লোকটি ভাল এবং উপকারী। নিতে পারলে ভালই হয়। তাছাড়া তখনো আরো জনা দুই-তিন কুলির প্রয়োজন আমাদের। কিন্তু ওর বয়েসের কথা চিন্তা করে দলে নিতে সাহস হল না। এত বয়েসে ঠিকে মজুরের কাজ করতে পারলেও দুর্গম হিমালয়ের অতি উচ্চতায় আধ মণ মালও নিতে পারবে না।

দেওয়ান সিংকে না নেবার পরামর্শ মালবাহকরা এবং ওদের মেটও আমায় দিয়েছে কাপকোটে। ওদের ভয় বৃদ্ধ দেওয়ান আট দশ হাজার ফুট ওপরে গিয়ে যদি আর মাল বইতে না পারে তখন হবে খুব মুশকিল। ওকে একা ছেড়ে দেওয়া যাবে না দুর্গম পথে। ওর মালটাও পড়ে থাকবে। অভিযানের ক্ষতি হবে। তাছাড়া পয়সা দিয়ে একটা বুড়ো মানুষকে নিয়ে যাবার যৌক্তিকতা কোথায়। মেট সোজা জানিয়ে দিয়েছিল, নিজের পরিচিত মালবাহক ছাড়া ও

অন্য কোনো অচেনা মালবাহকের সর্দারী করবে না অথবা তার দায়িত্ব নেবে না।

দেওয়ান সিংকে ডেকে বললাম, তোমার তো অনেক বয়েস হয়েছে, পারবে কি তিরিশ কিলো মাল বইতে?

—কিউ নহী সাহাব? জরুর পারব।

—কঠিন দুর্গম পথ। খুব কষ্ট হবে তোমার।

একটা ছোকরা মালবাহককে দেখিয়ে বলল,' সাব ও যদি পারে তাহলে আমিও পারব।

ওর উমর আর তাগদ তোমার উমর আর তাগদ এক হবে কি করে? তোমার তো বয়েস হয়েছে দেওয়ান।

কৌন বোলা ম্যায় বুড্ডা? দেওয়ান বেশ চটেমটে বলে।

সাধারণত মানুষ বার্ধক্যকে স্বীকার করতে চায় না। দেওয়ান সিংও যে স্বীকার করতে চাইবে না তা স্বাভাবিক। ওর মনে ব্যথা লাগুক সেটা আমার কাম্য নয়। তাই একটু ঘুরিয়ে বলি না না তুমি বুড্ডা হতে যাবে কেন? তবে অত মাল তোমার পক্ষে বওয়া কষ্টকর হবে।

দেওয়ান সিং খানিক আমার মুখের দিকে চেয়ে করুণ সুরে বলল, সাব ম্যায় দুখ-কা বুড্‌ঢা। উমর আমার মাত্র আটত্রিশ।

'দুখ-কা বুড্‌ঢা' শব্দটা বড় বিচিত্র লেগেছিল। হিমালয়ের অশিক্ষিত মানুষ অনেক মজার মজার কথা বলে শুনেছি আগেও। কিন্তু এমন একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ শব্দ কখনো শুনিনি।

দেওয়ান সিংকে আগেই ভাল লেগেছিল। তারপর 'দুখ-কা বুড্ঢা' যে সত্যি কথা তা ওর মুখ দেখে বিশ্বাস করেছিলাম। কাজেও নিয়েছিলাম। তবে আটত্রিশ বছর বয়েস প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি।

প্রথম দিনের পথ চলায় আর মাল বওয়ার ক্ষমতা দেখে ওর শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে আমার সন্দেহ দূর হয়েছে। অনেক সময় দেওয়ানকে বেশি মালও বইতে দেখেছি।

চলার পথে ওকে নানা প্রশ্ন করেছি। প্রথমটায় এড়িয়ে যেতে

চেয়েছে। পরে ওর ঘরের কথা সব শুনেছি। কিছুই ঢেকে চেপে রাখেনি।

কাপকোট থেকে মাইল বিশেক দূরে দেওয়ান সিংয়ের গ্রাম। নাম তার চম্পাগাঁও। তিরিশ-চল্লিশ ঘর মানুষের বাস। অঢেল জমি আর চারণভূমি সেখানে। জমি তো নয় যেন সোনা। হাল দিলেই জমি ভরে ওঠে ফসলে। সোমবচ্ছর দেদার খানাপিনা কর। অবসর সময়ে হয় ভেড়া বকরি চরাও নয়তো উল বোনো, কম্বল বানাও।

ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল দেওয়ানের। দাদী সুন্দর একরত্তি কুমারী একটি মেয়ে ঘরে এনেছিল ওর জন্যে। দেওয়ান আর সেই ছোট্ট মেয়েটা খেলা করত ঝগড়া করত মাছ মারত পিণ্ডার নদীতে।

যৌবন আসার মুখেই এলো প্রথম সন্তান। বাচ্চা বড় ভালবাসত দেওয়ান। তাই নবজাতক ঘরে আসতে ওর আনন্দ হয়েছিল সবার চেয়ে বেশি। কোথা দিয়ে যে সময় কাটত তা আর মনে পড়ে না ওর।

একে একে পাঁচটা সন্তান এলো। সবকটিই ছেলে। ছেলের কদরও ওদের সমাজে খুব। বাপের দোসর ওরা। জমিনের কাজে সাথী। মেয়ে হলেও আপত্তি ছিল না। বিয়েতে খরচ হয় বটে। তবে দেওয়ানের কিসের অভাব? দু-পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দেবার মতো ট্যাঁকের জোর ওর আছে।

পাঁচটা ছেলে ওর যেন চোখের মণি। নিজে কোলে পিঠে করে মানুষ করে। গ্রামের আর পাঁচটা মানুষ ঠাট্টা করে বলে, মেয়ে-মানুষের মতো ট্যাঁকে ছেলেদের নিয়ে দিনরাত ঘুরে মরদের বদনামী করছে। তাদেরও তো ছেলেমেয়ে আছে। কই, তারা তো ওর মতো আদেখলাপনা করে না।

পড়সীদের ঠাট্টায় হাসে দেওয়ান। বলে, ছেলেগুলো আমার বুকের হাড়-পাঁজর। হাড়-পাঁজর ছাড়া কি আর বাঁচা যায়?

ছেলেদের বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দিল দেওয়ান। পাঁচটা ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে

হবে। বড়টা ঠিক ওর নিজের মতো হয়েছে। আপন মনে পাহাড়ে জঙ্গলে মাঠে খেলা করে বেড়ায়। ছোট ভাইগুলো যেন চোখের মণি। পরের দুটোকে জমিনের কাজে লাগাতে পারবে। তার পরের দুটো দুধের শিশু। তাদের ভবিষ্যৎ ভাবতেই পারে না দেওয়ান।

স্বপ্ন যখন আকাশ ছুঁতে চায় তখন আর একজন অন্তরালে বসে তার কলকাঠি নাড়ে।

সেবার প্রচণ্ড খরায় চাষবাস শিকেয় উঠল। গ্রামে খাদ্যের জন্য হাহাকার। তারপরই বিশ্রী একটা হাওয়া বয়ে এলো দক্ষিণ দিক থেকে। সঙ্গে আনল মহামারী। ঘরে ঘরে বসন্তের গুটি ছড়িয়ে পড়ল। তার ধাক্কা এসে লাগল দেওয়ানের সংসারেও।

নন্দাদেবীর জাগার আর পূজো অর্চনা শুরু হল। দেবীর কোপ-দৃষ্টি পড়েছে ওদের গ্রামের ওপর। দেওয়ান সিংও জাগার গানের আসর বসিয়ে দেবীস্তুতি এবং পূজো অর্চনা করল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পটপট করে চারটে ছেলে মারা গেল বসন্ত রোগে।

শোকে পাগল দেওয়ান সিং উদ্ভ্রান্ত। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দেবীর মন্দিরে মাথা খোঁড়ে আর নিবেদন করে আমার বুকের পাঁজর ছেলে-গুলোকে ফেরত দাও দেবী।

দেবী তুষ্ট হলেন একসময়। মহামারী বিদায় নিল। বর্ষা নামল সারা পাহাড় জুড়ে। কিন্তু দেওয়ান ওর ছেলেদের ফিরে পেল না। গ্রামের মানুষ দেখল পুত্রঅন্তপ্রাণ দেওয়ান কদিনেই বুড়ো হয়ে গেছে। ওর অমন সুন্দর রং পুড়ে তামাটে, দেহের মেদ শুকিয়ে হাড় আর শিরা দেখা দিয়েছে। একমাথা কালো চুল পেকে সাদা।

—তারপরই ঘর ছাড়লাম সাব। ঘরে মন বসে না আমার।

ক্লান্ত দেওয়ান সিং নিজের বিগত দিনের বেদনাভরা কাহিনী বলতে বলতে থামল।

মূল শিবির পর্যন্ত দেওয়ানকে নিয়ে আর কোন ঝঞ্ঝাট হয় নি। ইতিমধ্যে প্রিতম সিং-এর সঙ্গে দেওয়ান সিংয়ের আবার ভাব জমে

উঠেছে বেশ।

মূল শিবিরের ওপরের এক শিবিরে হঠাৎ সংবাদ পৌঁছল আমার কাছে যে কোন মালবাহক কাজ করতে চাইছে না। প্রিতমকে নাকি দেওয়ান আবার মারধোর করেছে। অভিযোগ সেই একই অর্থাৎ দেওয়ানের খাবার চুরি করে খেয়েছে! প্রিতম নাকি স্বীকারও করেছে। অন্য মালবাহকেরা দেওয়ানকে এবার উত্তম মধ্যম মারধোর দিয়েছে। ওদের আরজি দেওয়ানকে বিদায় না করলে কেউ কাজ করবে না।

অনেক ভেবে শেষে দেওয়ান সিংকে আমাদের কিচেনের কাজে লাগাবার নির্দেশ দেওয়ায় শান্তি ফিরে এসেছিল।

সেবারের অভিযানের শেষে আমার জন্য যে বিরাট এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তা জানতাম না। আর এই বিস্ময় আমার হিমালয়ের পথে পথে ঘোরার জীবনে বিচিত্র এক সঞ্চয়। শত শত সাধারণ মালবাহকের মিছিলে 'ভুখ-কা-বুড্‌ঢা' দেওয়ান সিং নিজ পরিচয়ের আলোকে সমুজ্জ্বল।

পাহাড় থেকে ফেরার পথে একদিন দেওয়ান সিংকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঘর তোমার ভাল লাগে না বল, কিন্তু তোমার ছেলে বউ-এর প্রতি কর্তব্যও তো আছে। মাঝে মাঝে গ্রামে যেতে তো পার অন্তত ছেলেটার জন্য।

দেওয়ান আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে খানিক চেয়ে থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, শালা বহুৎ হারামী। বড় জ্বালায় সাব। ব্যাটার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না। প্রিতমের মতো শয়তান সেটা।

মাথার মধ্যে একটা সূত্র জট খুলছে যেন। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ছেলে কি প্রিতমের বয়সী?

—জী সাব। দেখতেও অনেকটা ওই শয়তানের মতো।

লোহারক্ষেত ডাক বাংলোর সামনেই কিচেন। দেওয়ান যত্ন করে খানা পাকিয়ে সবাইকে খাইয়েছে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর ও খায়। খাবার পর ডাক-বাংলোর ঢালা বারান্দায় পায়চারি করতে

করতে দেখলাম পিছন দিক থেকে লুকিয়ে প্রিতম সিং কিচেনে ঢুকল। আগেও একদিন প্রিতমকে কিচেনে লুকিয়ে ঢুকতে দেখেছিলাম। মনে কেমন যেন সন্দেহ হল। দেওয়ান আর প্রিতমের ব্যাপার নিয়ে এ ক'দিনে যে সূত্র খাড়া করেছিলাম তা মেলে কিনা দেখার জন্যে এগোলাম।

পা টিপে কিচেনের বারান্দায় এসে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। দেওয়ান সিং প্রিতমকে কোলের কাছে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে! প্রিতমও পরম আনন্দে খাচ্ছে!

কয়েক গ্রাস খাওয়াবার পর দেওয়ানের চোখ মুখের চেহারা বদলে যেতে লাগল। ক্রুদ্ধ চাউনী ওর। হঠাৎ প্রিতমের ঝাঁকড়া চুল মুঠো করে ধরে কয়েকটা ঝাঁকুনী দিল। চাপা গলায় গর্জন করে উঠল শালা বেইমান হারামী। ভেবেছিস আমার আদর কেড়ে আমায় ফাঁকি দিবি? পালাবি তো?

—নহী চাচা নহী। তুমকো ছোড়কে কভ্‌ভি নহী জাউঙ্গা। প্রিতম যেন কাকুতি মিনতির সুরে বলে।

—ভাগ হারামী। তুই আমার কে? দূর হ' শয়তান, দূর হ'।

দেওয়ানের চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। প্রিতম ঘরের বাইরে বেরিয়ে আমায় দেখে ঘাবড়ে গেল প্রথম তারপর দৌড় মারল।

দেওয়ান হতভম্ব। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বুঝতে বাকি নেই যে আমি সবকিছু দেখেছি।

আমি সহানুভূতির সুরে দেওয়ানকে বললাম, আমায় খুলে বল দেওয়ান। তোমার মানসিক যন্ত্রণা এতে অনেক কমবে। সবই তো আমায় বলেছ, আর ও কথাটা বলবে না?

দেওয়ান মাথা নামিয়ে নিচের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে ওর ভাষায় যা বলল তা যেমন বিচিত্র তেমনই মর্মস্পর্শী।

...দেওয়ানের বিশ্বাস ওর চোখের দৃষ্টিতে ওর নিঃশ্বাসে বিষ আছে, না হলে অমন চার চারটে ছেলে মারা যাবে কেন? যে ছেলেটা

একমাত্র জীবিত তাকেই আগলে থাকতে চেয়েছিল। নন্দাদেবীর কাছে প্রার্থনা করত সব সময় ওর শেষ সন্তানটাকে যেন কেড়ে না নেয়। একদিন মনে হল যে ওর কু দৃষ্টির জন্য আগেরগুলো মারা গেছে। এটাও টিকবে না। মনে হওয়া মাত্র ঘর ছেড়েছিল। ঘরে না গেলেও ঘরের খোঁজ খবর রাখে দূর থেকে।

প্রিতমকে ওর সেই একমাত্র জীবিত ছেলের মতো দেখতে বলে চোখে লেগেছিল। ওকে না খাইয়ে নিজে খেতে পারত না। প্রিতমকে খাওয়াতে খাওয়াতে নিজের ছেলের ছায়া দেখত ওর মধ্যে। আর সেই মুহূর্তে প্রিতমকে গালমন্দ করত। দেওয়ানের ভয় পাছে প্রিতমও ওর কু দৃষ্টির কোপে পড়ে তাই দূর-ছ্যা করে তাড়িয়ে দিত আর মারধোর করত।

দেওয়ানের কথা শোনার পর বুঝেছি ওর বলা 'দুখ-কা-বুডঢা'র অর্থ। মানুষটা দিনের পর দিন সন্তান হারানোর বেদনা বুকের পাঁজরের মধ্যে একান্ত সংগোপনে লালন করতে করতে ভেঙ্গে পড়ছে—এগিয়ে চলেছে বার্ধক্যের দিকে।

শ্রাবণী পূর্ণিমার শুভ দিনটি প্রায় সমাগত।

ভারতের নানা প্রান্ত হতে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এসে জমায়েত হয়েছে পহেলগাঁও-এ। হাজার হাজার তীর্থযাত্রীদের মালপত্র পরিবহণের বন্দোবস্তও এলাহি। সব কিছু সরকারী ব্যবস্থাপনায়।

সরকারী অফিসটার সামনে তীর্থযাত্রীর ভিড়। নানা কাউন্টারে তারা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে মালবাহক এবং ঘোড়া-ডাণ্ডি-কাণ্ডির জন্য অগ্রিম টাকা জমা দিচ্ছে। মাইক ফুঁকে নানা উপদেশ নির্দেশ বর্ষিত হচ্ছে সরকারী তরফে।

সরকারী অফিস বাড়িটার পিছনে বিরাট এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শত শত মালবাহক আর ঘোড়াঅলার মিছিল। ওরাও সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে খোলা আকাশের নিচে। বেটনধারী পুলিশ আর অফিসার ওদের নিয়ম শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে কায়দা করতে হিমসিম গলদঘর্ম অবস্থা।

মালবাহক আর ঘোড়াঅলারা কাশ্মীর হিমালয়ের নানা দুর্গম অঞ্চল থেকে সমবেত হয়েছে। কেউ এসেছে তিনদিনের পথ পাড়ি দিয়ে, কেউবা দু'দিন একদিনের পথ ভেঙে। ওরা জমায়েত হয়েছে প্রসিদ্ধ তীর্থযাত্রার অভিযাত্রীদের সেবায়। হাজার হাজার মানুষকে ওরা নিরাপদে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে মোক্ষের দ্বারে। তীর্থযাত্রীর আরাম নিদ্রার সব উপকরণ বইবে ওরা আপন গরজে। কারণ ওরা তীর্থযাত্রীর সেবায় নিবেদিত প্রাণ।

ভিড় আর ঠেলাঠেলিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত জাহাঙ্গীর বাটের। দরদর করে ঘাম ছুটছে মুখ বুক আর দেহ জুড়ে। একটু ছায়া পেলে বসত। নজর বুলিয়ে একটাও বড় গাছের চিহ্ন দেখল না ওদের চৌহদ্দিতে। পাহাড়ের দিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের গা ঘেঁষে ফেনসিং দেওয়া সরকারী বাগিচা। ওখানে ছোট বড় অনেক গাছের সারি— অফুরন্ত ছায়া। বেড়ার ধারে বসলেও ছায়ার প্রসাদ লাভ করা যায়।

জাহাঙ্গীর লাইন ভেঙে বেরিয়ে এলো। বেড়াঘেরা বাগানটার দিকে এগিয়ে যেতেই লাঠিধারী শান্তিরক্ষক ওর ভোট কম্বলের জোব্বার কলার টেনে ধরে বলল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

জাহাঙ্গীর অবাক একটু। তবু মুখে ক্লান্ত হাসি টেনে বলল, গরমে বড় তক্‌লিফ হচ্ছে, গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম নেবো জমাদার সাব।

—নবাবজাদা আমার। গরমে তকলিফ হচ্ছে? চল্‌, লাইনে বস গিয়ে।

হাতের মোটা রুল দিয়ে গোঁতাতে গোঁতাতে জাহাঙ্গীরকে ঘোড়া-অলার মিছিলে ঢুকিয়ে দিল সেপাইজী।

দুর্গমের পাহাড়ী মানুষ জাহাঙ্গীরের এ অভিজ্ঞতা নতুন। প্রতিবাদ করে উঠতে যাবে হঠাৎ পেছন থেকে কে আবার ওর হাত ধরে টানল।

ঘুরে দেখে ওদের পড়শী আব্দুল বাট।

—চুপ করে এখানেই বসো জাহাঙ্গীর ভাই। আমাদের নসীব ওদের রুলের গোঁত্তা খাওয়া। প্রতিবাদ করতে গেলে পেটাবে।

—তা বলে একেবারে চুপ করে থাকব? জাহাঙ্গীর ক্রোধে ফেটে পড়ে। গাঁ থেকে আনার সময় তো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছিল। অমরনাথজীর জন্যই আমরা এত তকলিফ করে এসেছি। ওরা রুলের গুঁতো মারার কে?

আব্দুল বাট বেশ কয়েক বছর ধরেই অমরনাথজীর যাত্রায় ঘোড়া নিয়ে আসছে। নিজের থেকে অবশ্য আসে না, আসতে হয় ভয়ে। সরকারী লোক গাঁয়ে ঢেঁড়া দিতে এলে আব্দুলের যেন জ্বর আসে। প্রথম বারের অভিজ্ঞতা আজও ভোলেনি। সেবার সরকারের তরফে গ্রামে গ্রামে ঢেঁড়া দিয়ে জানান দিল অমরনাথজীর মেলা অমুক দিনে। হাজার হাজার মেহমান তীর্থযাত্রী আসবে কাশ্মীর উপত্যকায়। তাদের সেবা করা প্রতিটি কাশ্মীরির পবিত্র কর্তব্য। যার ঘরে ঘোড়া আছে তাকেই যেতে হবে পহেল গাঁও-এ। উপযুক্ত পারিশ্রমিক তো পাওয়া যাবেই, মায় ঘোড়ার জন্যে অঢেল চানা আর সবুজ ঘাসের বন্দোবস্ত থাকবে। ঘোড়ার মালিকের জন্যে সরকারী লঙ্গরখানায় বিনা পয়সায় প্রচুর খানা-পিনারও ব্যবস্থা আছে এবার।

আবদুল বাটের বহুদিনের বাসনা অমরনাথজীর মেলায় যায়। গত বছর একজোড়া খচ্চর কিনেছে জমি চাষের জন্যে। ওদের নিয়েই যাবার বাসনা। কিন্তু জমির কাজ তখন জোরদম চলছে। খচ্চর নিয়ে তীর্থ-যাত্রায় সামিল হতে গেলে চাষের দফারফা। সোমবচ্ছর খাওয়া শিকেয় উঠবে। তবু ইচ্ছে হয় যেতে। দিন দশবারো জমি আর কাউকে দিয়ে একটা খচ্চর নিয়ে বেরিয়ে পড়বে নাকি আবদুল?

হঠাৎ আবার ঢেঁড়ার কাঠি বেজে উঠল। ঘোষকের কণ্ঠে এবার একটু গম্ভীর সুর, যারা নিজেদের ঘোড়া অথবা খচ্চর নিয়ে যাত্রায় যাবে না তাদের ঘোড়ার লাইসেন্স বাতিল করা হবে। জরিমানাও হতে পারে!

আবদুল শুনে অবাক! এত মিষ্টি কথার পর একি আদেশ জানাল ঘোষক! এ তো জবরদস্তির ব্যাপার। জমির কাজ ফেলে তবে যেতেই হবে? না গেলে ঘোড়ার লাইসেন্স বাতিল আর জরিমানা! এ-কেমন সেবা!

সেই থেকে আবদুলকে মেলায় যোগ দিতে হচ্ছে প্রতিবার। মাঝে মাঝে ভেবেছে ঘোড়া দু'টো বিক্রি করে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে যাবে। কিন্তু পারেনি। ঘোড়া দুটো চাষে যেমন সাহায্য করে তেমনই বাকি সময়টায় মালপত্র নিচের শহরে বয়ে নিয়ে আসে। এতে যাত্রায় ক'দিনের কষ্টটা বাদ দিলে অনেক সাশ্রয়। তাই শান্তিরক্ষকের লাল চোখ আর রুলের গোঁতা খেয়েও আসছে আবদুল বাট প্রতি বছর আর পাঁচজন ঘোড়াঅলার মতো।

জাহাঙ্গীর রাগে মুখ লাল করে বলল, আমি মেলায় কাজ করব না। ঘোড়া নিয়ে আজই গাঁয়ে ফিরে যাব।

—অমন কাজটি করো না জাহাঙ্গীর ভাই। ঘোড়ার লাইসেন্স বাতিল হয়ে গেলে খাবে কি? তাছাড়া জেল জরিমানা তো ফাউ। এ-বারটা সহ্য করে নাও, সামনের বারে অন্য চিন্তা করা যাবে।

আবদুলের উপদেশে আরো চটল জাহাঙ্গীর। চিৎকার করে বলে উঠল, না-না, জেল জরিমানা যাই হোক আমি মেলায় ঘোড়া নিয়ে যাবো না।

জাহাঙ্গীরের উঁচু গলার কথাগুলো শান্তিরক্ষক এক কর্তাব্যক্তির কানে যেতেই বেটন হাতে সামনে এসে দাঁড়াল।

—কি বলছিস?

—আমি মেলায় ঘোড়া নিয়ে যাবো না সাব।

—কেন?

—আমার তবিয়ত ভাল না।

—ঘোড়ার তবিয়ত ঠিক আছে তো?

থতমত খেয়ে বোকার মতো অফিসারটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জাহাঙ্গীর। কি কথার কি জবাব! বলল, তা ভাল।

—ব্যস্। তাহলেই হবে। মাল তো আর তুই বইবি না, তোর ঘোড়া বইবে। তোর তবিয়ত ভাল খারাপে যায় আসে না কিছু।

এমন সময় একদল যাত্রী সরকারী পরচা হাতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। অফিসার ব্যস্ত হয়ে রুল হাতে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সারিবদ্ধ ঘোড়োঅলা আর মালবাহকের দল বুক ফুলিয়ে দৃঢ় ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাদের পাঁচদিন-কা-মালিকের নজর কাড়ার কাজে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠল।

আবদুলও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

এখন ভাবে আজ দু'দিনই বুক ফুলিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে মালিকের দৃষ্টি কাড়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মালিক পায়নি। বুঝেছে আসলে সবই ভাগ্য, বুক ফুলিয়ে নজর কাড়া যায় না পাঁচদিন-কা-মালিকদের। আশ্চর্য লাগে ওর, একদল মোক্ষকামী মানুষ ছুটছে দুর্গমের পথে মোক্ষের সন্ধানে আর ওরা সেই মোক্ষসন্ধানী মানুষের কৃপা দৃষ্টিতে নিজেদের মুক্তি খুঁজছে। এ মুক্তি প্রতীক্ষার, এ মুক্তি রোদ জল আর তুষারঝঞ্ঝার হাত থেকে মুক্তির প্রতীক্ষা।

আবদুলের মুক্তি এবারও হ'ল না।

তীর্থযাত্রীর দল খুশি মতো ঘোড়াঅলা আর মালবাহক বাছাই করে নিয়ে গেল। যারা লাইন থেকে বেরিয়ে মালিকের পিছু পিছু গেল তাদের মুখে মুক্তির আনন্দ। বাকি বুক ফুলিয়ে থাকা হতভাগ্যরা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়ল ধূলিশয্যায়। ওদের বুকের মধ্যে ধরে রাখা জমাট নিঃশ্বাস হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তখন।

•

দিনের আলোয় টান ধরেছে। পহেলগাঁওয়ের সবুজ পাহাড়ের আড়ালে সূর্যদেব পাটে বসেছেন। দূর থেকে আজানের সুরেলা ধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছে। সরকারী কাউন্টারে তখন কিছু যাত্রী মালবাহক আর ঘোড়াঅলা নিয়োগের জন্য টাকা জমা দিচ্ছে।

জাহাঙ্গীর বিরস বদনে জিজ্ঞেস করল, নামাজের সময় তো হ'ল আবদুল ভাই, ছুটি হবে না?

আবদুল মৃদু হেসে বলল, আমাদের নামাজের সময় বাবুদের কাজ শেষ হলে হবে। সন্ধ্যা উৎরে গেলেও। আমরা সেবক কিনা…

— রাখো তোমার সেবক আর সেবক। দু'দিন ধরে দাঁড়িয়ে বসে সারা গা-গতরে ব্যথা ধরে গেছে। খানিক চুপ করে কি ভেবে আবদুলের কানে কানে বলল, আজ রাতেই আমি পালাবো।

আবদুল চমকে উঠে। বলে খবরদার জাহাঙ্গীর ভাই ও কাজটি করো না। পালালে ঘোড়া দুটো খোয়া যাবে। বেওয়ারিশ মাল বলে সরকারের গুদামে চালান হয়ে যাবে। তারপর সাজা তোআছেই।

—আবদুল ভাই আমি পাগল হয়ে যাবো। আমার জেল হোক আর জরিমানাই হোক আজ রাতে আমি পালাবোই।

জাহাঙ্গীর হু-হু করে কেঁদে ফেলল। আবদুল ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করল।

লাইনের সামনের সারিতে সোরগোল উত্তেজনা। ঝিমিয়ে পড়া মানুষগুলো নতুন আশায় বুক বেঁধে উঠে দাঁড়াল। মালিকের দল একে একে মুখ দেখছে আর এগোচ্ছে। মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল আবদুলের। রুলের গুঁতো খায় খাবে তবু মতলবটা কাজে লাগাতেই হবে।

দুই মহিলা এগিয়ে আসতেই আবদুল দেখল পাশে পুলিশ কেউ নেই। বুক ঠুকে মহিলাদের নজর কেড়ে জাহাঙ্গীরকে দেখিয়ে বলে উঠল, মাইজী এ বহুত আচ্ছা গাইড। ঘোড়া দুটোও খুব তেজী।

মহিলাদের একজন থমকে দাঁড়াল। জাহাঙ্গীরের আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে বলল, খানা পাকাতে পারবে তো?

প্রথমটা চমকে উঠল আবদুল। কাফেরের খানা ওরা পাকায় না। মহা সমস্যা। জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে তাকাল। জাহাঙ্গীর ভাবলেশ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে। ও দিকে লাইনের অন্য ঘোড়াঅলা আর মালবাহকরা চেঁচামেচি সোরগোল তুলেছে! প্রতিবাদ জানাচ্ছে আবদুলের বে-আইনীভাবে মালিককে ডেকে নেয়ায়।

গোলমাল শুনে পুলিশ এগিয়ে আসছে এদিকেই। আবদুল প্রমাদ গুনল। এই মুহূর্তে একটা কিছু না করতে পারলে জাহাঙ্গীরের কপালে দুঃখ আছে। নিজের হাল যে কি হবে তা ওর জানাই আছে। আর সব জেনেই অন্যায় কাজটা করে বসল ও।

মহিলাকে আবদুল বলল, জাহাঙ্গীর ভাই সবথেকে ভাল খানা বানায়। মোগলাই খানার তো কথাই নেই।

ঘোড়াঅলা আর মালবাহকদের সোরগোল শুনে মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ওরা চিৎকার করছে কেন?

—জাহাঙ্গীর ভাই ভাল গাইড আর ভাল রাঁধুনী, ঘোড়া ছুটোও টগবগে তাই সবাই ওর বিরুদ্ধে। আবদুল হঠাৎ জাহাঙ্গীরের হাত ধরে লাইন থেকে বার করে দিয়ে বলল, যাও ভাই, মাইজীদের ভালমতো সেবা কোরো।

পুলিশ এসে দাঁড়াতে মহিলা জাহাঙ্গীরকে বলল, চলো, তোমার ঘোড়া কোথায় দেখি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আবদুল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে প্রচণ্ড এক আঘাত অনুভব করার পরেই দেখল ধূলিশয্যায় লুটিয়ে পড়েছে। চারদিক থেকে অজস্র কণ্ঠের অভিযোগ আর পুলিশের রুলের গোঁত্তায় আহত বিপর্যস্ত আবদুল দেখল জাহাঙ্গীর আস্তাবলের দিকে চলেছে ঋজু দৃঢ় পদক্ষেপে।

আহত বিপর্যস্ত আবদুল বাট সদ্য ঘটে যাওয়া কাহিনীটি বলার পর পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। আমার মালবাহক আবদুলের প্রতিবেশী। পরিচর্যার দায়টা তাই ওর ওপরই পড়েছিল। আমি নীরব শ্রোতা।

পহেলগাঁও-এ তখন সন্ধ্যা নামছে। দিনান্তের হলুদ আলো পরিপূর্ণ ছড়িয়ে পড়েছে আবদুলের চোখে মুখে। এতো মার খাবার পরও মুখে ওর একটা প্রশান্তির ছাপ।

আবদুলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল নিজের মুক্তি না হলেও জাহাঙ্গীরের মুক্তির আনন্দ ও অনুভব করতে পারছে।

* * * *

উত্তর গাড়োয়াল হিমালয় অঞ্চলের নিতি গ্রাম ভারত-তিব্বত সীমান্ত ঘেঁষা। দু' এক ঘর ছাড়া বাকি সবাই ওখানে সারা বছর বাস করে না। হিমালয়ের অতি উচ্চতায় মরশুমী জনপদের মতো নিতিও একটা মরশুমী গ্রাম। গ্রামবাসীদের বেশির ভাগই শীতের আগমনে নিচের কোনো গ্রামে চলে যায় সংসারপত্র গুছিয়ে নিয়ে। আবার গরম পড়লে উঠে আসে। জীবিকা ওদের চাষবাস আর পশুপালন। চাষের জমির জন্য নিতিগ্রাম গড়ে উঠেছে। জমির উর্বরতা যতদিন আছে গ্রামও আছে ততদিন।

সবাই যখন নিচে নেমে যায় তখন দু' এক ঘরের বাসিন্দা থেকে যায়। ওরা সারা বছরই বাস করে গ্রামে। শীতের মাসগুলো অসহ্য হলেও থাকতে হয়। কারণ, নিচের কোনো গ্রামে বাসা করার মতো আর্থিক সামর্থ ওদের নেই।

অসমর্থ ওই দু' এক ঘর বাসিন্দার মধ্যে কেদার সিং ব্যতিক্রম। কেদার সিংএর সামর্থের কমতি নেই। কোনো দিনই ঠিক অভাব কাকে বলে জানে না। বাপ ছিল জাঁদরেল ব্যবসাদার আর গ্রামের মোড়ল। তিব্বত নিতি সীমান্তের কাছে হাট-এর অর্ধেক মালিকানা ওর বাপেরই ছিল। পশম লবণ আর দুস্প্রাপ্য পাথরের এলাহি ব্যবসা করে বেশ কিছু জায়গা জমি আর সম্পত্তি করেছিল।

বাপের ব্যবসার দোসর ছিল কেদারের বড় ভাই প্রতাপ সিং। কিছু পড়াশুনা করেছিল বলে কাজ কারবার বুঝত ভাল। বাপ মারা যাবার পর প্রতাপ যোশীমঠে সরকারী কন্ট্রাক্টরের ব্যবসা ফেঁদে বসে আজ লাল হয়ে গেছে। বাড়ি গাড়ি সব হয়েছে। ইদানিং আবার তিন-চারটে যাত্রীবাস চালু করেছে।

কেদার সিং বাপের কনিষ্ঠ পুত্র। তাই আদর আবদার একটু বেশিই পেয়েছিল। আর ওই আবদারের ফলে লেখাপড়া পাঠশালার

গণ্ডি পেরতে পারেনি। পাঠশালার বইএর চেয়ে পাহাড় অরণ্য ওর ভাল লাগত বেশি।

কিশোর বয়েসে ঘর ছেড়ে পালাত প্রায়ই। আপন মনে আনোয়াল বাখালদের সঙ্গে চলে যেত দূর দূরান্তের পাহাড়ে। পাহাড় আর বরফের প্রতি যে ওর কি আকর্ষণ তা ও নিজেও জানত না।

ঘর-পালান ছেলে নিয়ে মা-বাবার সমস্যার অন্ত নেই। পাঠশালার মাষ্টারদেরও হিমসিম খাবার দাখিল। বাপের ভয়, শেষে ছেলেটা আওয়ারা না হয়ে যায়। মায়ের ভাবনা পাহাড়ে পর্বতে পরীর হাতে পড়লে অকালে মরবে ছেলে। কেদার কিন্তু ওসবের পরোয়াই করে না।

ছেলেকে শায়েস্তা করার জন্য বাপ শেষে কেদারের পড়াশুনো ছাড়িয়ে নিজের ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিল। সঙ্গে করে নিয়ে গেল নিতি গিরিবর্ত্ম সংলগ্ন ত্রিবেণী হাটে।

এতদিনে কেদার মনের মতো কাজ পেল যেন একটা। নতুন পথ নতুন পাহাড় আর নতুন পরিবেশে অচেনা মানুষ—সব কিছুই ওর বিচিত্র লাগল।

এ-হাটে আরক অর্থাৎ পাহাড়ী কড়া গোছের মদের ছড়াছড়ি। শীতপ্রধান দেশ। শরীর গরম রাখার জন্য ছাং আর আরক সবাই খায়। যারা কড়া নেশা করতে চায় তাদের ছাং চলে না। আরকে নেশা জমে ভাল, তাই আরক পাওয়া যায় সর্বত্র।

প্রথমবার এসেই ছাং খেয়েছিল। ছাং ওদের ঘরে ঘরে তৈরি হলেও সবাই খায় না। ঠাণ্ডা জায়গায় না খেলে নয় তাই খেতে হয়েছিল কেদারকে। বড় ভাই প্রতাপ আর বাপ তো আরক ছাড়া নেশাই করে না।

প্রথম প্রথম ভাল না লাগলেও শেষে ভালই লাগত। আর এক সময় কড়া নেশার তাগিদে ছাং ছেড়ে আরকই ধরেছিল কেদার সিং।

বাপ মারা যাবার পর বড় ভাই প্রতাপ সিং যোশীমঠে নিজস্ব ব্যবসার খাতিরে পাকাপাকি বাসা বেঁধেছিল। মায়ের শরীর ভেঙে

পড়েছিল বলে প্রতাপ মাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। কেদার সিং একা থাকত নিতিগ্রামে। অবশ্য শীত পড়ার মুখে নেমে আসত যোশীমঠে এবং সেখান থেকে মা আর ভাবীর সঙ্গে চামোলীতে চলে যেত। চামোলিতে কেদার সিংএর কিছু জমিজায়গা ছিল।

গরমের ক'টা মাস নিতিগ্রামে থেকে তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা করত। যে ক'দিন নিতিগ্রামে থাকত সে ক'দিনের খাবার ব্যবস্থা থাকত গঙ্গাদের বাড়িতে। গঙ্গার বাবা কেদারের বাপের বন্ধু ছিল। কিছু খরচ যোগাত বলে কেদারের যত্নআত্তির কমতি হত না। আর এই যাওয়া আসার অবসরে কখন যেন গঙ্গা কেদারের মন জুড়ে বসে গিয়েছিল।

সওদা নিয়ে তিব্বতের হাটে থাকার সময় গঙ্গার কথা বেশি করে মনে পড়ত আর তার অদর্শনে দীর্ঘশ্বাস পড়ত বারবার। অবসর সময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখত উত্তুরে মেঘ জমছে কি না। উত্তুরে মেঘ শীত ঋতুর প্রতীক। ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ যখন সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে তখন দক্ষিণে বাতাসকে পরাজিত করে আসবে উত্তুরে বাতাস। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার প্রবাহ নিয়ে শীত পাঁচ মাসের জন্য আসর জমিয়ে বসবে। ঝরবে তুষার। আর ওই উত্তুরে বাতাস আসার আগে দুর্গমের পাহাড়ী মানুষ ঘরমুখো হবে।

সেবার তিব্বতের হাট সেরে গ্রামে ফিরে শুনল গঙ্গারা এবার শীতে নামবে না নিচে।

ফসল যা হয়েছে তাতে সোমবচ্ছরের খরচ যুগিয়ে চামোলীর ভাড়া করা বাড়িতে থাকা অসম্ভব। কেদার সাহায্য করতে চেয়েছিল, গঙ্গার বাবা-মা রাজি হলেও গঙ্গা রাজি হয় নি। শেষে ওদের সঙ্গে কেদার সিংও থেকে গিয়েছিল নিতিতে।

তুষারপাত শুরু হয়ে যাবার আগে গঙ্গা ও কেদার শুকনো লকড়ি আর তাজা ঘাস সংগ্রহ করতে নিতিগ্রাম ছাড়িয়ে সেপুক-এ চলে আসত। কাঠ আর ঘাস সংগ্রহ হয়ে গেলে দুজনে রোদে পিঠ দিয়ে বসে গল্প করত।

কেদার বলত তিব্বতের কথা, গঙ্গা হাঁ করে শুনত। নতুন দেশ নতুন মানুষ আর নতুন পথের কথা যেন গিলত গঙ্গা। আর এই একান্ত গল্পের অবসরে কেদার গঙ্গার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ত।

গঙ্গা কেদারের মাথায় মুখে বুকে হাত বুলিয়ে দিত। আর কেদার চোখ বুজে মতলব ভাঁজত কেমন করে গঙ্গার দেহটা নিজের দখলে আনবে।

হঠাৎ হঠাৎ-ই কেদার গঙ্গার সুডৌল গলা জড়িয়ে মুখটা নামিয়ে আনত নিজের মুখের কাছে। গঙ্গা কেদারের মতলব বুঝে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার কৃত্রিম চেষ্টা করত।

তারপর ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকার আগে গঙ্গা এক ঝাপটায় কেদারকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দৌড় লাগাত।

বরফ পড়ার আগে পর্যন্ত এ খেলা রোজই হত। বরফ পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৃহবন্দী হয়ে পড়ল ওরা। যেদিন বরফ পড়া বন্ধ থাকত সেদিন জলের সন্ধানে দু'জনে বেরিয়ে পড়ত বাইরে। হাঁটু অব্দি বরফে চলতে চলতে নতুন জীবনের নানা ছবি আঁকত দু'জন।

আরও মাসখানেক বাদে বাইরে বেরনোও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। দিনরাত তুষারপাত আর ঝড়। এই গরম আবহাওয়ায় আরক খুব ভাল সঙ্গী। প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে মোকাবিলা করা যায় অনায়াসে। কেদার আরক ধরল। সারা দিনে মাত্র বার দু' তিন দেখা হত গঙ্গার সঙ্গে। আবার দেখা যখন হত তখন ওর মা বাবা থাকত কাছে। সুতরাং চোখের ইশারা ছাড়া কোনো কথাই হত না।

যত দিন যায় আরকের মাত্রাও বাড়তে থাকে ততো। শেষে খাওয়া দাওয়া ভুলে যেতে লাগল কেদার। দিনরাত আরকের কড়া নেশায় বেহুঁস প্রায়। গঙ্গার মা বাবাও এতে চটল খুব।

সেই যে আরকের নেশায় ওকে পেল তা আর ছাড়তে পারল না কেদার সহজে। ব্যবসাপত্র নষ্ট হতে বসল। তিব্বতের হাটে গিয়ে আরো মাতাল হয়ে থাকত। আর এই নেশার মধ্যে ও ভুলে থাকত গঙ্গাকে।

ক'টা বছর আরও কেটে গেল। গঙ্গার বাবা মারা গেছে। গঙ্গা এখন বাপের ব্যবসা দেখে। দলের সঙ্গে তিব্বতে যায়। শীতের আগে ফিরে আসে। কেদারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ যোগাযোগ কমে গেছে কাজের তাগিদে। তাছাড়া কেদারের আরক খাওয়া পছন্দ করে না গঙ্গা।

কেদারের নেশা বেড়েছে আরও। তিব্বতের হাটে যেতে পারে না। যা কিছু সম্বল ছিল তা বসে বসে শেষ করেছে। গঙ্গা বুঝিয়েছে কেদারকে। অনুরোধ করেছে মদ ছাড়ার জন্য। কিন্তু মদ ছাড়তে পারেনি কেদার।

একদিন গঙ্গা হঠাৎ বলে বসে, আরক না ছাড়লে আমায় পাবে না। হয় আরক ছাড় না হয় আমায় ছাড়। আরক আমি ঘেন্না করি। যেদিন সত্যি সত্যি আরক ছাড়বে সেদিনই আমি তোমার ঘরে আসব।

গঙ্গার কথায় কেদারের সেই প্রথম হুঁস ফেরে। মালপত্র নিয়ে তিব্বতের বাজারে যাবার সময় গঙ্গা আরও বলল, তুমি আরক না ছাড়লে আমি আর ফিরব না দেখ। অভিমানে গঙ্গার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

গঙ্গাকে এই প্রথম কাঁদতে দেখল কেদার। ওর বুকের মধ্যেও কি যেন একটা হু হু করে উঠল। হঠাৎ গঙ্গাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কানে মুখ রেখে বলল, আর আমি আরক খাব না রে গঙ্গা, আর কখনো আরক ছোঁব না। .

গঙ্গার দুচোখ আনন্দে চিকিয়ে উঠেছিল। কেদারকে অবাক করে দিয়ে সেই প্রথম গঙ্গা ওর নরম দুটো ঠোঁট দিয়ে কেদারের সারা মুখে একটা সুখের চিত্র এঁকে দিয়েছিল।

•

তারপর দু' যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

যুগের আবর্তনে অনেক কিছুই পালটে গেছে। বহুদিনের চেনা পথ নিতি সীমান্ত বন্ধ হয়েছে। বাপ দাদার জাত ব্যবসা বন্ধ।

এপারের মানুষ ওপারে যায় না, আসে না ওপারের মানুষ এ-পারে। নতুন নতুন পথ তৈরি হয়েছে প্রতিরক্ষার কারণে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী আস্তানা গেড়েছে সীমান্তে। হয়েছে বিদ্যালয়। সভ্য জগতের বহু বস্তু এসে গেছে নিঃসঙ্গ নিতিগ্রামে।

মস্ত মনোহারী দোকান খুলেছে কেদার সিং। পাহাড়ী মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায় ওখানে। শুধু গ্রামবাসীর প্রয়োজন মেটায় না, মেটায় সীমান্তের জওয়ানদেরও। তারা আসে কেদারের দোকানে সিগারেট আর বিড়ির সন্ধানে।

কেদার সিং নিজে হাতে চোলাই করে বানায় কড়া আরক। কেদারের হাতে তৈরি আরকের বহু খদ্দের। রোজই গণ্ডা গণ্ডা বোতল খালি হয়ে যায়। নিজে হাতে আরক বানালেও কিন্তু কেদার সিং তার এক ফোঁটাও খায় না। আগে আগে অনেকেই অনুরোধ করত ওকে। কেদার জবাবে ক্লান্ত হেসে বলত, গঙ্গার কাছে শপথ করেছিলাম আর কখনও আরক খাব না বলে, আজ খাই কি করে? গঙ্গার অভিমান হবে না তাতে?

কেদার সিংএর মুখ থেকেই শুনেছি গঙ্গার কাহিনী। এ কাহিনী নিতিগ্রামের মানুষ আর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা সবাই শুনেছে। আর সেই জন্যেই কেউ ওকে আরক অথবা ছাং খাবার জন্যে অনুরোধ করে না।

উত্তর গাড়োয়াল অঞ্চলে অভিযান শেষ করে আজ দু'দিন এখানে বিশ্রাম নিচ্ছি। মাসখানেক আগে প্রথম যখন আসি তখন আলাপ হয়েছিল কেদার সিংএর সঙ্গে। বৃদ্ধ কেদার সিং আমায় খুব আদর যত্ন করেছিল। নিজের দোকানে থাকার জন্যে বলেছিল। অন্যত্র আশ্রয় মেলায় বৃদ্ধের অনুরোধ রাখতে পারিনি তখন।

আমায় চা আর আলুসেদ্ধ দিয়ে আপ্যায়ণ করে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাবে?

বলেছিলাম, পূর্বী কামেট হিমবাহ অঞ্চলের কথা।

আমাদের অভিযানের বিশদ বিবরণ দেওয়ার পর বৃদ্ধ কেদার সিং

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, গঙ্গাকে নিয়ে ওদিকে গেছি বটে তবে পূর্বী কামেট হিমবাহে যাইনি কখনো। আর একটু সামনে বসুধারা তাল আছে—সেখানে গেছিলাম একবার। বেশি যেতাম নিতি পাসের ওদিকে, তা সে পথ বন্ধ হয়ে গেল।

খানিক চুপ করে সামনের তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, নিতি পাসের ওদিকে গেলে গঙ্গার খোঁজ নিতে বলতাম।

—কে গঙ্গা? জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আমার প্রশ্নে ম্লান হেসে বলেছিল, আমার দুলহান্।

—তোমার দুলহান্ নিতি পাসের ওদিকে থাকে নাকি?

—হ্যাঁ সাব, তিব্বতে।

—কবে গেছে?

বৃদ্ধ কেদার সিং স্থির হয়ে গালে হাত দিয়ে খানিক ভাবল। তারপর বলল, তা প্রায় দু'যুগ হয়ে গেছে।

আমায় আগ্রহী শ্রোতা বুঝে কেদার সিং তার জীবনের বেদনাময় কাহিনীর সবটাই বলেছিল।

হিমালয়ে এসে যুবক-যুবতীর এমন প্রেম কাহিনী এর আগে আর শুনিনি, বিশেষ করে এমন এক প্রেমিকের মুখ থেকে যে যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়ে বার্ধক্যের দুয়ারে পা রেখেছে। শুনিনি কখনো কোনো হিমালয়ের মানুষের নাম যে তার প্রেয়সীর জন্য জীবনের শেষ বেলায় এসেও এমন আকুল প্রতীক্ষায় বসে থাকে।

দু' যুগ আগে গঙ্গা তিব্বতের হাটে বেচাকেনা সেরে তাড়াতাড়ি ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছিল। ঋতুর পর ঋতুর পরিবর্তন হয়েছে, বছর গড়িয়েছে একটির পর একটি। কেদার সিং গঙ্গার কথা রেখেছে—আর কোনদিন আরক অথবা ছাং খায়নি। অপেক্ষা করেছে তার দুলহনের জন্য সুদীর্ঘ দু'টি যুগ—গঙ্গা কিন্তু ফেরেনি আজও।

সীমান্ত থেকে এক্দা জওয়ান আসতেই বৃদ্ধ কেদার সিং শুধায়, কেউ এলো নাকি ওপার থেকে? কোনো মেয়ে?

রক্ষীরা চেনে সবাই বৃদ্ধ কেদার সিংকে। জানে ওর প্রতীক্ষার কথা। মাথা নেড়ে তারা বলে, এখনো আসেনি। তবে তোমার দুলহান্ এবার নিশ্চয় ফিরবে দেখো।

—সীমান্তের লড়াই থেমেছে?

—হ্যা।

—দুপারের মানুষ যাতায়াত করছে না কেন? কেদার সিং আকুল প্রশ্ন করে।

—এবার মানুষ চলাচল করবে।

—কবে জওয়ান ভাই?

—বসন্তকাল এলেই। স্তোক দেয় জওয়ান।

—গঙ্গা এলেই কিন্তু আমায় আগে খবরটা দিও ভাই।

মাথা হেলিয়ে জওয়ানরা বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়···

প্রতীক্ষা ক্লান্ত কেদার সিং একবার অ.-ার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে দূরের তুষারমৌলী হিমশিখরের দিকে ঘোলাটে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কেদার সিংএর বেদনা আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বেদনার অনুরণন তুলে বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাসকে মুক্তি দিল।

জানিনা দু' যুগ আগে সীমান্তের ওপারে চলে যাওয়া গঙ্গা আজও এপারের বৃদ্ধ মানুষটির জন্যে অপেক্ষা করছে কি না!

বাস ছুটে চলেছে উঁচু-নিচু পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে।

রাণীক্ষেত থেকে গোয়ালদাম একটানা প্রায় ঘণ্টা ছ'য়েকের বাসভ্রমণ। মাঝে গরুড়ে মাত্র আধ ঘণ্টার বিরতি—বাস বদল। গরুড় থেকে গোয়ালদাম প্রায় ষোল মাইল কাঁচা পথ। পিচ পড়েনি পাথুরে মাটির পথে।

কাঁচা রাস্তায় বাস ভ্রমণ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

হেলতে দুলতে বাস চলছে গোয়ালদামের দিকে। যাত্রীরাও হেলছে দুলছে। দু-একজন মাঝে মাঝেই বমি করছে। যারা অভ্যস্ত তারা বমি করে না। ওই অভ্যাসটা আমারও। বাসের দোলানীতে বমি আসে না বরং ঘুম পায়।

চোখ বুজে আসছে কিন্তু ঘুমুতে পারছি না। পাশে পাহাড়ী একটি মেয়ে বসে। যদি ঢুলে ওর গায়ে পড়ি সেই ভয়। অবশ্য হিমালয়ের মানুষের শহরের মতো ছুৎবাই নেই। মেয়ে পুরুষ গায়ে গায়ে পাশাপাশি বসে। লেডিস সিটের বালাই নেই পাহাড়ী বাসে। বাসের দোলানীতে একে অপরের গায়ে ভর দিয়ে ঝিমোয়। কাউকে কখনও কিছু মনে করতে অথবা প্রতিবাদ করতে দেখিনি।

পাশে বসা মেয়েটি হঠাৎ ওয়াক তুলে বমি করে ফেলল। মুখ দিয়ে ছিটকে আসা জলে আমার প্যান্টের নিচের দিকটা সম্পূর্ণ ভিজে গেল। মেয়েটি আমার প্যান্টের অবস্থা দেখে লজ্জায় রাঙা। তাঁড়াতাড়ি নিজের ঘাঘরার নিচু অংশ দিয়ে প্যান্টে লাগা বমির জল মুছতে লাগল।

মেয়েটিকে বললাম, যা হবার তাতো হয়ে গেছে। মুছে আর কি হবে?

মেয়েটির সমস্ত মুখে রক্তের ছোপ পড়ল। মাথা নিচু করে বলল, মাপ করবেন, আপনার প্যান্টটা একেবারে নোংরা করে দিলাম।

—কি আর করা যাবে? পরে পাল্টে নেব।

অন্য সহযাত্রীরা সাময়িক উসখুস করেছিল। পরে আবার পূর্ববৎ। এ ধরনের ঘটনা প্রায় রোজই ঘটে। এ নিয়ে তাই ওদের গুলতনের অবকাশ নেই।

হেলেদুলে বাস চলছে। কখনও চড়াই উঠছে টপ গিয়ারে আবার নামছে উৎরাই ব্রেক চেপে। ভাঙ্গাচোরা পথ, যাত্রীরা ঝিমুচ্ছে। ঝিমুচ্ছে পাশে বসা মেয়েটিও। অবাক হলাম। সাবধানও হলাম, যদি আবার বমি করে দেয়!

মেয়েটা খুব ঘুমচ্ছে। সাড়া পর্যন্ত নেই। বমি করার আগে তবু ঝাঁকানীতে সাবধান হচ্ছিল। এখন সে সম্বিৎ নেই। প্রায় আমার বুকের ওপর ঢলে পড়েছে। সরে যাবার কোনো লক্ষণ নেই। ভীষণ রাগ হচ্ছিল। একেই বমি করে মেজাজ খাপ্পা করে দিয়েছে তায় আবার ঘাড়ের ওপর ঘুমনো। তুবার হাত দিয়ে মুখটা তুলে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু ঠিক ঘুমন্ত শিশুর মতো আবার ঢুলে পড়ল কাঁধের ওপর। হাল ছেড়ে দিয়ে ওর ঘুমন্ত ভারী দেহটা বওয়াই সাব্যস্ত করলাম।

পাক্কা এক ঘণ্টা মেয়েটির দেহের ভার বয়ে কখন ক্লান্ত হয়ে নিজেই ঝিমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। মেয়েটির ডাকে তন্দ্রা ভাঙ্গল। খেয়াল হল নিজেই কখন ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মনে মনে লজ্জা পেলাম।

বাস দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের একটা বাঁকে। বিকাল উৎরে গেছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই নামবে সন্ধ্যার অন্ধকার। উপত্যকা অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে তখন ঘুমবে।

মেয়েটি পোঁটলা নিয়ে নামার আগে জিজ্ঞেস করল, কোথায় নামবেন?

—গোয়ালদাম।

—এটাই তো গোয়ালদাম। নেমে আসুন শিগ্‌গীর। বাস ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

পিঠে ঝোলা নিয়ে মেয়েটির পিছনে পিছনে নেমে এলাম। গোয়ালদামে আগেও এসেছি ক'বার। সেদিনের সঙ্গে আজকের গোয়ালদামের অনেক পরিবর্তন। তাই প্রথমটা চিনতে পারি নি।

—এখানে থাকবেন কোথায়? মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, পরিচিত কেউ আছে?

মাথা নেড়ে জানালাম নেই কেউ। কাল আসবে পরিচিত গাইড। কলকাতা থেকে সেইরকমই লিখেছি।

—আমার সঙ্গে চলুন তাহলে।

— কোথায় ?

—কাছেই আমাদের ঘর।

—না থাক। আজ রাতটা এখানে হোটেলে কাটিয়ে কাল ভোরেই হাঁটা দেব কুয়ারীর পথে।

—কুয়ারী যাচ্ছেন ? মেয়েটির গলায় বিস্ময়। এদিকে আগে এসেছেন কখনো ? রূপকুণ্ড গেছেন ? ত্রিশূলী তীর্থে ?

—হ্যাঁ দুবার।

—দুবার ! বিস্ময়ে চোখ দুটো ওর চিকচিক করে উঠল। বলল ইস, আপনি কত ভাগ্যবান। তাহলে তো আর আপনাকে হোটেলে থাকতেই দেব না। আমার গরীবখানায় চলুন।

আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে উৎরাই পথে গ্রামের দিকে নিয়ে চলল। ওর আবেদন এত আপন আর সাবলীল যে এড়িয়ে যেতে পারলাম না।

মাঝারি দু-কামরার ঘর। সামনের ঘরে একটা তক্তাপোষ, দুটো নতুন চেয়ার। তক্তাপোষের ওপর মোটা গদি ঝলমলে রঙিন চাদরে মোড়া। কাচের আলমারীতে ঠাসা পুতুল, কাচের বাসন আর পানপাত্র ও পুরনো বিলিতি মদের খালি বোতল শোভা পাচ্ছে। দেওয়ালে পুরনো ক্যালেণ্ডারের ছবি। বিভিন্ন ভঙ্গিমার অর্ধনগ্ন নারীর চটুল দেহ। সব মিলিয়ে টিপিক্যাল পাহাড়ী আধা-শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের একটি চিত্র।

নোংরা প্যান্ট সার্ট ছেড়ে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে আয়েস করে বসেছি চেয়ারে। বাইরে সন্ধ্যার আঁধার ছড়িয়ে পড়েছে। দূরে গোয়ালদাম বাসষ্ট্যাণ্ড এবং বাজারে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। বাতাসে ভেসে আসছে ট্রানজিস্টারের হাল্‌কা হিন্দী ফিলমি গানের সুর। কুয়াশার ক্ষীণ প্রলেপ সামনের উঁচু পাহাড়টার মাথা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নামছে উপত্যকায়।

মহেশ্বরী এ বাড়ির একা বাসিন্দা। তা না হলে এতক্ষণে দ্বিতীয় প্রাণীর উপস্থিতি টের পেতাম। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। পথের

সাক্ষাৎ। বাসে একটাও কথা হয়নি। গায়ে বমি করে দেওয়া থেকে বুকের ওপর দীর্ঘ পথ ঘুমিয়ে আসায় সাময়িক দৈহিক সান্নিধ্য ঘটেছিল বটে। পরিচয় কিংবা হৃদ্যতা হয়নি মোটেই। এমন একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে যে তার বাড়িতে অতিথি হতে হবে, তা কিন্তু কল্পনাও করিনি। অবশ্য আমার হিমালয় ঘোরার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আরও আছে। তাই ভাবনার তেমন কিছু পাইনি।

মহেশ্বরী ভিতর ঘরে ডাকল আমায়।

মাথা নিচু দরজা দিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে দেখলাম, মহেশ্বরী উনোনের ধারে বসে রান্নার আয়োজন করছে। বড় একটা কাঠের পিঁড়ির ওপর হরিণের চামড়া পাতা। আমায় বসতে বলল পিঁড়িটায়। এদেশে অতিথির সম্মান সবার ওপরে। তাই সবচেয়ে বড় আর ভাল আসন বরাদ্দ হয় অতিথির জন্যে।

এক পেয়ালা গরম চা আর বড় একটা প্লেটে অনেকগুলো আলুর পাকোড়ি দিয়ে বলল, বিশেষ কিছু বানাতে পারলাম না। কটা পাকোড়ি বানিয়েছি নিজের হাতে। পাকোড়ি খান তো?

ওর কথার জবাব না দিয়ে চা আর গরম পাকোড়িতে মন দিলাম।

—খুব খিদে পেয়েছিল, তাই না?

—ভীষণ।

—ইস, কিছুটা খাবার দোকান থেকে আনান উচিত ছিল। ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি এখুনি আনাচ্ছি। বাইরে কার উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ল —রতন ভাইয়া, একবার এদিকে এসো।

অন্ধকার ভেদ করে তাগড়া জোয়ান একটা পাহাড়ী যুবক এসে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বিচিত্রভাবে হেসে নমস্কার করল। ওর হাসিটা কেন যেন ভাল লাগল না। মহেশ্বরীকে মানা করলাম খাবার আনাতে। মহেশ্বরীর রতন ভাইয়া বিদায় নিল অন্ধকারে।

—ছেলেটি কে?

—গ্রামেই থাকে। মাঝে মাঝে ফাইফরমাস ওকে দিয়েই করিয়ে নিই।

—তোমার নিজের কেউ নেই এখানে? একা থাক নাকি?

মহেশ্বরী এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। উত্তর না পেয়ে বুঝলাম ও একা। অবাক লাগছে, এমন সমত্থ মেয়ে একা থাকে কোন্ সাহসে। বয়েস চব্বিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়। যেমন রূপ তেমন স্বাস্থ্য। আমি ওর অপরিচিত বিদেশী। আমায় যেচে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলই বা কেন? আর অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা রতনভাই অমনভাবে হাসলই বা কেন? অথচ মেয়েটার মধ্যে এখনও কোনো কিছু বিব্রত হবার মতো পাই নি। ব্যবহার এতই আপন যে ওকে পর বলে মনে হয় না। তবু এক বিশ্রী অস্বস্তি আমার মাথাটা গোলমাল করে দিচ্ছে।

মহেশ্বরী উনোনের সামনে বসে কুমায়ুনী খানা বানাচ্ছে। আগুনের লালচে আভা ওর ভরাট গোলাপী মুখে বিচিত্র এক লাবণ্য ছড়িয়ে দিয়েছে। গভীর তন্ময়তায় ডুবে কি যেন ভাবছে।

ভেতরের ঘরটার সঙ্গে বাইরের ঘরের তফাৎ চোখে পড়ল। ছোট একটা তক্তাপোষ, তাতে ধবধবে সাদা চাদর বেছান। বাইরের ঘরের মতো চেয়ার আলমারীর বালাই নেই এ-ঘরে। দেওয়ালে রামসীতা আর মহাদেবের ছবি। দরজার ওপর পাশাপাশি দুটো ছবি। একটা সুন্দর এক শিশুর অপরটা ছিপছিপে এক যুবকের। ঘরের এ কোণে রান্নার বন্দোবস্ত আর এক কোণে কাঠের সিংহাসনে রামসীতার পাথরের মূর্তি। পাহাড়ী জংলা ফুল দিয়ে সাজান। চার-পাঁচটা ধূপ জ্বলছে। আশ্রমিক পরিবেশ। বাইরের ঘরের চটুলতার এতটুকু উত্তাপ নেই এখানে।

উনোনের পাশে আমার জামাপ্যান্ট শুকাচ্ছে। মহেশ্বরী এসেই ওগুলো কেচেছে নিজের হাতে। আমার কোনো ওজর আপত্তিই শোনে নি।

এখন রাত অনেক।

বাইরে নিঝুম প্রকৃতি। সাইরেন পাখির একটানা ডাক। মাঝে

মাঝে পাহাড়ী কুকুর ডেকে উঠছে। ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছি। গায়ে ভোট কম্বল জড়ানো। পায়ের দিকের দরজা খোলা। সামনের ঘরে মহেশ্বরী ঘুমচ্ছে। ওখানে শুতে চেয়েছিলাম। রাজী হয় নি মহেশ্বরী। এ খাটটা ওর নিজস্ব। আমিই নাকি প্রথম মানুষ যাকে ও তার নিজের বিছানায় শুতে দিল।

সারা দিনের ঘটনাগুলোকে জুড়ে শেষ মাথায় এসেও মহেশ্বরীকে স্পষ্ট করে আবিষ্কার করতে পারছি না। আমায় আদর করে নিয়ে এসে নিজের খাটে শোয়ানো, যত্ন-আত্তি করা ইত্যাদির কারণটা কি? এ-কি নিছক ভদ্রতা না কি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

পাশের ঘরে ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপা আওয়াজ। মহেশ্বরী ঘুমচ্ছে নির্ভাবনায়। যেমনটি আমার বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল বাসে। মহেশ্বরীর দেহের উত্তাপ অনুভব করতে পারছি। ভোট কম্বলের মিষ্টি একটা সুবাস বিচিত্র এক আবেশ আনছে দেহের শিরায় শিরায়। ভোট কম্বলটাও মহেশ্বরীর নিজস্ব। মেয়েটার কথা চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিলাম।

একটা স্পর্শ। ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখলাম মুঠো মুঠো অন্ধকার।

মাথার চুলে কে যেন বিলি কাটছে। চমকে উঠে বসতে গিয়ে সামলে নিলাম। পাশ ফিরলাম। মহেশ্বরীর দেহের মিষ্টি গন্ধ চিনতে ভুল হয় নি। বিদেশ বিভূঁইয়ে আদরযত্ন আর সেবা পেতে কার না ভাল লাগে। বিশেষ করে মহেশ্বরীর মত তন্বী যুবতীর স্পর্শ।

মহেশ্বরীর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার কপাল আর মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। মুহূর্তে এক ঝলক রক্ত সারা দেহের শিরা-উপশিরা মাতিয়ে মাথায় উঠে গেল। বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক আলোড়ন। চেতনা ছুটে চলল আদিম অরণ্য অন্ধকার গলিপথে। নিজেকে হারিয়ে ফেললাম নির্মম এক বাসনার কাছে। মহেশ্বরীর হাতটা

সজোরে টেনে বুকে চেপে ধরলাম। আর মুহূর্তে মহেশ্বরার সুঠাম দেহ হুমড়ি খেয়ে আমার বুকের ওপর এসে পড়ল।

মুহূর্ত কয়েকের বিভ্রান্তি! বুকের মধ্যে শুনলাম—ভাই সাহেব ঘুম আসছে না।

মহেশ্বরীর শান্ত আবেগ জড়ান ভাই সাহেব সম্বোধন আমার বিভ্রান্ত চেতনায় যেন কষাঘাত করল! দেহের উষ্ণ রক্তস্রোত স্তিমিত হয়ে বইল অন্য খাতে। লজ্জা পেলাম। হাত ছেড়ে দিয়ে জড়ান গলায় বললাম—তুমিও তো ঘুমচ্ছনা মহেশ্বরী।

ভারী দেহটা আমার বুক থেকে তুলে নিয়ে বসল মহেশ্বরী বিছানার এক কোণে। দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা। তারপর মৃদু অনুযোগের সুরে বলল, আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু আপনার ঘুম না হলে কাল পথ চলবেন কি করে ভাই। কুয়ারীর পথ যে ভীষণ দুর্গম।

ওর কথার কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না। বললাম—রাত কত এখন?

—আর ঘণ্টা দু'য়েক বাদেই ভোর হবে।

—তুমি শুয়ে পড়। আমি বরং ঘুমের চেষ্টা করি।

—আমার ঘুম হয়ে গেছে। আপনি একটু ঘুমোন তো দেখি! মৃদু ধমকের সুরে কথাটা বলে মাথার চুলে আগের মতো বিলি কাটতে লাগল মহেশ্বরী।

গভীর প্রশান্তিতে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম।

উৎরাই পথে দেবভূমি দেবলের দিকে চলেছি। গাইড রতন সিং আসছে পিছনে।

পাইন চীর আর দেবদারু গাছের অরণ্যলোক। বুনোট ছায়া বাঁধানো পথ, নাম না জানা পাখির বিচিত্র কুজন আর হিমেল হাওয়ায় মনটা বার বার পিছনে ফিরতে চাইছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে মহেশ্বরীর মুখ। সেই মুখটাই আমায় টানছে বার বার।

সকালে মহেশ্বরী শাদা জরির কাপড় পরেছিল। কি সুন্দর মানিয়ে-

ছিল কাপড়টায় ওকে। বিদায়ের সময় ওর চোখের জল কোনো লজ্জা কোনো সরমের বাধা মানেনি। একটা রাতে ওর কাছে আমি অনেক পেয়েছি। যে ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। বিদায়ের আগে ওকে কটা টাকা দিতে গেছিলাম। বলেছিলাম, মিষ্টি খেও। তার উত্তরে ও বলেছিল, ভাইসাব যদি মেহেরবাণী করে ফেরার পথে বহিনের জন্য মিষ্টি নিয়ে আসে তবেই খাব। এখন টাকা তোমার কাছেই থাক। পথে লাগবে।

রতন সিং আজ ভীষণ গম্ভীর। আমার ওপর ওর সব শ্রদ্ধা নাকি চলে গেছে। বাজারেই খবর পেয়েছিল আমি মহেশ্বরীর ঘরে উঠেছি। সেই মুহূর্তেই ও ফিরে যাচ্ছিল দেবলে। কিন্তু ওর নাকি সন্দেহ হয় যে মহেশ্বরী আমায় নিশ্চয়ই ভুলিয়ে নিয়ে গেছে নিজের ডেরায়। না হলে আমার মতো শরিফ আদমী একটা খারাপ মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটাতে পারে না। কথাটা শুনে দারুণ একটা ঝাঁকুনি খেয়েছিলাম। রতনের কাছে মহেশ্বরীর অনেক কথা শুনলাম পরে।

মহেশ্বরী রতনদেরই গ্রামের মেয়ে।

কাঠের কনট্রাক্ট পেয়েছিল দিল্লীর এক কোম্পানী। সেই কোম্পানীর ছোটসাহেব কাঠ চেরাইয়ের কাজ দেখার জন্য মাঝে মাঝে আসত দেবলে। দেবলে এলেই ডেরা বাঁধত মাধব সিংয়ের বাড়িতে। মাধব সিং এ অঞ্চলের বেশ পয়সাঅলা লোক। সাহেব দেখলেই খাতির করে নিজের বাড়িতে তুলত। কোম্পানীর সঙ্গে মাধব সিংয়ের লেবার কনট্রাক্ট ছিল। তাই কোম্পানীর লোকেরা ওকে খাতির করত খুব।

মাধব সিংয়ের মেয়ে মহেশ্বরী। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে তখন সবে পা দিয়েছে। ছোটসাহেবের নজর কেড়েছে মেয়েটা। মাধব সিং স্বপ্ন দেখত মেয়ে তার সুখী হয়েছে আর নিজের কনট্রাকটের কাজটাও ফুলে ফেঁপে উঠছে ছোটসাহেবের কৃপায়। ছোটসাহেব কুমায়ুনেরই ছেলে। সুতরাং সমাজে কোনো বাধাই পাবে না মাধব সিং। ওপথে তখন সবে জিপ চলার রাস্তা হয়েছে। ছোটসাহেব আলমোড়া থেকে জিপে আসত। মহেশ্বরীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত দেবল

থেকে গোয়ালদামের পথে পথে। মাঝে মাঝেই ওকে নিয়ে চলে যেত গরুড় বাগেশ্বর অথবা কাপকোটে। একবার তো ঘুরে এলো নৈনীতাল। সেবার মহেশ্বরী কি খুশি। সখীদের নৈনীতালের লেক আর পাহাড়ের মনোরম দৃশ্যের কথা বারবার বলত। মাধব সিং খুশি। অবাধ মেলামেশার অনেক সুযোগও করে দিয়েছিল।

মহেশ্বরীর ভরা যৌবন বছর না গড়াতেই রূপ আর লাবণ্যে ফেটে পড়তে লাগল। দেহ কেমন ভার ভার লাগে। মহেশ্বরী মনে মনে শঙ্কিত। অনাগত এক আতঙ্ক ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে যেন। ছোট-সাহেবকে একদিন বলেই বসল ওর আতঙ্কের কথা। সাহেব উড়িয়ে দিল মহেশ্বরীর অনাগত সম্ভাবনার ভয়। ওকে আশ্বাস দিয়ে নিয়ে গেল আলমোড়ায় ডাক্তারের কাছে। মহেশ্বরীর জীবনের ট্রাজেডিও শুরু হল এই আলমোড়া থেকেই।

দিন দশেক বাদে গ্রামে ফিরল সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে। অনাগত আশঙ্কার কথাটা তার চাপা রইল না। শত মুখে শান্ত দেবলের নিভৃত পাহাড়ের গায়ে ফিস্ ফিস্ করে আলোচিত হল। মহেশ্বরী সন্তান-সম্ভবা। ছোটসাহেব আলমোড়া থেকে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিয়েছে।

সমাজচ্যুতির ভয়ে মাধব সিং মেয়ের জন্য গোয়ালদামে ছোট্ট একটি বাড়ি তৈরি করে সরিয়ে দিল মহেশ্বরীকে। সে দিন থেকেই মেয়েটা পথে বসেছে। মাধব সিং আজ আর মেয়ের নামও নেয়না। কনট্রাকটরের ব্যবসাটা বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

মহেশ্বরীর একটা ছেলে আছে। তাকে আলমোড়ার মিশনারীদের কনভেণ্টে রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। মাঝে মাঝেই ছেলেটার টানে আলমোড়া ছুটে যায়।

উৎরাই পথ শেষ হয়েছে পিণ্ডার গঙ্গার কোলে। সামনে পাহাড় আর নদীর পটভূমিকায় শান্ত দেবালয় দেবল। পুল পার হয়ে জিপের রাস্তা চলে গেছে ওপার দিয়ে। মহেশ্বরীর কথা মনে পড়ছে। ছায়াছবির মত ভেসে বেড়াচ্ছে ওর গোয়ালদামের ছোট বাড়িটা।

ছুটো ঘর। সামনেরটার চেয়ে ভেতরটার তফাৎ অনেক। সামনেরটায় তরল চটুলতা আর ভেতরটায় শুভ্র স্নিগ্ধতা। ভেতর ঘরে ছুটো ছবি। একটা শিশুর অপরটা কি ছোটসাহেবের ?

মহেশ্বরীর ছুটো ঘরের ছু'টো রূপ। ওর সত্তাও বুঝি ছুটো। বাইরের চটুলতার সঙ্গে যার এতটুকু মিল নেই। আমি ওর ভেতরের স্নেহশীলা সত্তাটাই দেখেছি সেদিন রাতে। যেখানে সে দেবী—জননী।

দশ হাজার ফুট উঁচু মালারি গ্রামের সরকারী ডাকবাংলোয় গত তিন দিন যাবত আটকা পড়ে আছি।

ছুর্গম হিমালয়ের বুকে সভ্যতার প্রয়োজনে পথ গড়ছে মানুষ। দূর নিকট হয়েছে আজ। কিন্তু প্রকৃতিকে বাগে আনতে পারেনি বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে।

মাঝে মাঝেই হিমালয়ের বিচিত্র প্রকৃতি বিদ্রোহ করে বসে। আর মানুষ তখন হয়ে পড়ে অসহায়। আমাদেরও সেই বিচিত্র প্রকৃতির বিদ্রোহের মুখে পড়তে হয়েছে।

ক'দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস নেমেছে। মাইল ছু'য়েক আগে এক জায়গায় পথ ভেঙ্গেচুরে একাকার। পাথর মাটি আর গাছ পড়েছে সেখানে। গাড়ি পথের ছু'পারেই আটকে পড়েছে। পায়ে হাঁটার একটি সংক্ষিপ্ত পথ অবশ্য আছে। কিন্তু আমাদের মালপত্রের যা বহর তাতে পায়ে হেঁটে অত মাল নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বর্ডার রোড-এর শ্রমিক আর এনজিনিয়ররা কাজে হাত দিয়েছে। আবর্জনা সরিয়ে পথ পরিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আরো তিনচার দিন লাগবে ভাঙ্গা পথ সম্পূর্ণ হতে। সুতরাং বাধ্য হয়েই সরকারী ডাকবাংলোয় দিন গুণতে হচ্ছে।

দিনের বেলায় ডাকবাংলো ছেড়ে চলে যাই গ্রামে। সংকীর্ণ

মেটে গ্রাম্য পথে ঘুরে ঘুরে দেখি পাহাড়ী মানুষের দৈনন্দিন জীবন। মালারি গ্রামের অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হয়েছে। দেখা হলেই ডাকে, আদর আপ্যায়ন করে।

শহর কলকাতার নাম ওরা জানে। কারণ, ওদের অনেকেই ভারতের অনেক শহর দেখেছে সৈন্য বিভাগে কাজ করার কল্যাণে। ওরা জিজ্ঞাসা করে শহরটা এখন কি রকম, ট্রামে-বাসে লোক ঝুলে যায় কিনা, বৃষ্টি হলে এখনো কি পথে জল জমে, ইত্যাদি।

দিন শেষে যাই বর্ডার রোডের স্থানীয় দফতরে। খোঁজ করি পথ তৈরির আর কতটুকু বাকি। আশার আলো দেখি রোজ। তারপর ফিরে আসি ডাকবাংলোয়। রাতটাই যা বড় খারাপ লাগে। তাস আর গল্পগুজবে কতটাই বা সময় কাটানো যায়?

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। দিনের আলোর বিবর্ণ রঙ। সূর্য মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকেই আছে। দূরের ঢেউ খেলানো সবুজ অরণ্য ঘেরা পর্বতশ্রেণী কুয়াশার দুর্ভেদ্য আবরণের আড়ালে অদৃশ্য। মাঝে মাঝে ঝিরঝির বৃষ্টি হয়। আদিম অরণ্যলোক থেকে মেঘ সরে যায় পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। বৃষ্টি থামলেই আবার মেঘ-গুলো গুটিগুটি এসে বাসা বাঁধে বার্চ সিডার দেওদার আর রডো-ডেনড্রনের গাছ-গাছালির ঘেরাটোপে।

বিবর্ণ দিনটি বিদায় নিলো অনেক আগেই। সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল মালারি গ্রামের শেষ দিগন্তরেখায়। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা।

ওয়াল ল্যাম্প নামিয়ে নিয়ে ডায়েরি লিখছি। বন্ধুরা ঘরের কোণে বসে তাস খেলায় মেতে উঠেছে। মাঝে মাঝে ডবল-রিডবলের হুংকার। রান্নাঘরে শেরপারা রাত্রের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত। বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টির একটানা ঝমঝম শব্দ। হাড় কাঁপানো উত্তুরে বাতাসের মাতন। সব মিলিয়ে বিচিত্র এই পরিবেশে বন্ধ দরজার বাইরে কাঁপা কিন্তু দরাজ গলায় কে যেন কবিগুরুর কবিতা আবৃত্তি করে উঠল।...

"...অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি ;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।..."

সচকিত হয়ে তাকালাম দরজার দিকে। ভেজানো দরজা ঠেলে আজানুলম্বিত আলখাল্লার মতো জলপাই রঙের ওভারকোট পরা একটি লোক ঘরে ঢুকে পড়ল। নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত জোড় করে আবৃত্তি করে চলল—

"তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস-নিশি।..."

কে লোকটা? কি চায়, বুঝতে পারছিনা। কবিতাটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় আবৃত্তি করছে। লোকটি কি প্রবাসী বাঙালী? আমরা এখানে আটকে পড়েছি খবর পেয়ে এসেছে দেখা করতে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলাম আগন্তুকের মুখের দিকে।

লোকটি কিন্তু বেহুঁস। কবিতা শেষ হয়নি তখনো। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির ভাষা পড়ায় মন নেই ওর। বন্ধুদের জমে ওঠা তাসও নির্বাক, ডবল-রিডবলের উত্তেজনা স্তব্ধ।

"...ওগো বিফল বাসনারাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি, দেবী, লহ কর পাতি
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি,
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি,
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনারাশি।"

আবৃত্তি শেষ হল। নীরবতা নেমে এলো ঘরে। বাইরে বৃষ্টির একটানা রিমঝিম আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার গানের ঐক্যতান। কারো মুখে কোনো কথা নেই। আগন্তুক হাসি হাসি মুখে দেখছে আমাদের। তারপর ভাঙ্গা বাংলায় বলল, ওঃ, কতদিন পরে গুরুদেবের খোদ কলকাতার আদমী দেখলাম। ওপরে যাবার সময় শুনেছিলাম আপনাদের কথা, তখন দেখা করতে পারিনি। আজ ফিরেই শুনলাম আপনারাও হিমালয় থেকে ফিরেছেন তাই দেখা করতে এলাম।

কেউ কোনো জবাব দিতে ভুলে গেছি। লোকটিকে কেবল বোবার মতো দেখছি আর দেখছি। ভাবছি এ কে? বাঙ্গালী না অবাঙ্গালী? অবাঙ্গালী হলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এমনভাবে কণ্ঠস্থ করল কি করে? সামান্য উচ্চারণগত বিকৃতি থাকলেও লোকটি সাবলীলভাবে বাংলায় কথা বলছে কেমন করে!

—আপনারা বাঙ্গালী নন? আর ইউ নট বেঙ্গলীজ?

লোকটির বিস্ময়ভরা প্রশ্নে হুঁশ ফিরল আমার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, হ্যাঁ, ঠিক।। কিন্তু আপনি?

ব্যস। মুহূর্তে লোকটি দরজার চৌকাঠে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। উপাসনার ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বলল, আজ আমি ধন্য। কতকাল পর—কত যুগ পর আমার গুরুদেবের দেশের মানুষের দর্শন পেলাম। আমার জীবন সার্থক।

লোকটির চেহারা এবং পোষাক-আশাক দেখে মোটেই ভদ্র বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু বাংলা বেশ ভালই জানে দেখছি। বসার কথা বলতে এতক্ষণ মনেই ছিল না, স্মরণ হওয়ায় বললাম, ভেতরে এসে বসুন।

খুব খুশি হল লোকটি। দরজার সামনে থেকে ঘরের ভেতরে পাতা একটা চেয়ারে বসল এসে। তারপর আমাদের সবার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

আমরাও দেখছি। মানুষটি বেশ লম্বা, কিন্তু চেহারা খুবই খারাপ। মুখ চোখে একটা দারুণ অত্যাচার আর বিপর্যয়ের গভীর ছাপ। এক

গাল খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ কামানো হয়নি কতকাল হয়তো। ভাঙ্গা-চোরা মুখের মধ্যে কিন্তু চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে থাকেন কোথায় ?

মুচকি হেসে বলল, যেখানে মাথা গোঁজার জায়গা যখন পাই সেখানেই থাকি।

—মানে, আপনার ঘর কোথায় ?

—সারা হিমালয়।

—অর্থাৎ পাকা ঘর বলে কিছু নেই আপনার।

লোকটি খুশি খুশি মুখে বলল, ঠিক ধরেছেন, আমি বাউণ্ডুলে।

—আপনার নাম ?

এবার হো হো করে লোকটি হেসে উঠল। বলল, বাউণ্ডুলের আবার নাম পরিচয় থাকে নাকি ? বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল··

"···নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ,
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে—"

দু লাইন গাওয়ার পরই জিজ্ঞাসা করল, ঠিক গাইলাম তো গুরুজী ?

—একি, আমায় শেষে গুরুজী ঠাওরালেন নাকি ? হেসে বললাম।

—কেন নয় ? আমার গুরুদেবের দেশের মানুষ তো আমার গুরুই হবে। খানিক আমার মুখের দিকে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি রেখে হাত-জোড় করে গদগদ গলায় বলল, আমি গুরুদেবের দীন সেবক—ভক্ত। আমার দুর্ভাগ্য গুরুদেবকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পাইনি। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই তিনি আমার মানসপটে ভেসে ওঠেন স্পষ্ট।

—আপনি কি বাঙ্গালী ?

লোকটি আমার প্রশ্নে একবার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলো। উদাস চোখে টেবিলের ওপর রাখা ওয়াল ল্যাম্পটার অনুজ্জ্বল আলোক শিখার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে যেন। উদাস দৃষ্টির মধ্য দিয়ে মন ওর কোন দূর দিগন্তে যেন পাড়ি দিয়েছে।

প্রথমটায় লোকটিকে পাগল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ও পাগল নয়, মদ্যপ। ভুরভুরে দেশী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে ওর গা থেকে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আবার প্রশ্ন করলাম, আপনার নামটা কিন্তু জানতে পারলাম না।

—আই হ্যাভ নো নেম। লেকিন আপনি যদি আমার পোষাকী নামটা জানতে চান তো বলি—কবিয়াল। ঠাট্টা করে বন্ধুরা ডাকে ওই নামে।

—আপনি তাহলে কবি!

—কবি নই। তবে কবিতা ভালবাসি। গুরুদেবের কবিতা আমার জীবন। একটা সঞ্চয়িতা আর গীতাঞ্জলিও আছে আমার কাছে।

ওভারকোটের ভেতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিবর্ণ একটা খবরের কাগজ মোড়া বই বার করল কবিয়াল। সাবধানে মোড়ক খুলতেই চোখে পড়ল একখানা গীতাঞ্জলি। বইটা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বলল, আমার গীতা। কখনো কোনো মুহূর্তে একে কাছছাড়া করিনা।

কবিয়াল দেখছি সত্যি কাব্য রসিক এবং রবীন্দ্র ভক্ত। না হলে এতবড় একখানা বই কে পকেটে রাখবে!

—বন্ধুরা ঠাট্টা করলেও আপনার কবিয়াল নামটি কিন্তু যথার্থ।

—বন্ধুরা বলে, পাহাড়ে নাকি কবিতা চলে না। এখানে রোটির জন্য লড়াই কর, লড়াই কর প্রকৃতির সঙ্গে—না হলে মরতে হবে। আমি বলেছি, তা লড়াই তোমরা করগে যাও। আমার রোটির চেয়ে কবিতা অনেক প্রিয়। প্রকৃতিকে আমি ভালবাসি, লড়াই করতে যাব কোন দুঃখে?

কবিয়াল কথাক'টা বলে তাকাল আমার মুখের দিকে। তারপর সমর্থনের আশায় বলল, কিঁউ গুরুজী, কিছু বেঠিক বলেছি।

সায় দিতেই হয়। যে লোক রুটির চেয়ে কবিতা ভালবাসে তাকে সমর্থন না করে পারা যায় না। বললাম, ঠিকই বলেছেন।

কবিয়াল খুবই খুশি হল দেখলাম।

বিবর্ণ গীতাঞ্জলির পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায়

থমকে গেলাম। কালো কালিতে গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে লেখা একটা নাম—লতিকা সান্যাল।

নাম লেখা পাতাটা মুড়ে কবিয়ালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বইটা কে দিয়েছিল আপনাকে ?

চমকে উঠল কবিয়াল। আমার মুখে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বলল, আমার খুব পরিচিত একজন।

—কি নাম তার ?

কবিয়াল বিব্রত বোধ করল। কোনো জবাব দিল না।

এমন সময় আমাদের কুক এবং কেশলী চা আর গরম পাকোড়া নিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকল। ঘরের মধ্যে সামান্য চাঞ্চল্য। ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে চা আর গরম পাকোড়ার কদর আলাদা।

একমগ চা এগিয়ে দিলাম কবিয়ালের দিকে। কবিয়াল চায়ের মগ হাতে ইতস্তত করছে, খাবে কি খাবে না। তারপর করুণ চোখে তাকাতেই বুঝলাম নেশা কেটে যাবার ভয়ে অমন করছে।

—যদি আপত্তি থাকে তো চা খাবেন না। ভাল রাম আছে, চলবে ?

—গুরুজীর কৃপা। আমার মনের কথা ঠিক বুঝেছেন তো !

কুককে ইশারা করতে বেশ কিছুটা রাম মগে করে এনে দিল।

এক চুমুকে প্রায় অর্ধেকটা রাম গিলে নিয়ে মেজাজ খুশ হয়ে উঠল কবিয়ালের। কথা আর কবিতার ফোয়ারা ছুটল। বেগতিক দেখে বন্ধুরা একে একে সরে পড়ল। মাতালের বকবকানি প্রলাপ ভাল লাগল না ওদের।

—লতিকা সান্যাল কে ? চেনেন নাকি ?

কবিয়ালের প্রলাপ বন্ধ হল। আমার মুখের দিকে খানিক অবাক হয়ে চেয়ে থেকে হাতের গীতাঞ্জলির দিকে নজর পড়ামাত্র কেমন যেন চমকে উঠল। তারপর স্থির তাকিয়ে থাকল হাতে ধরা মগের মধ্যের রঙিন পদার্থটির দিকে। ভাবলেশশূন্য দৃষ্টি। তরল পদার্থের মধ্যে বুঝি নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে কবিয়াল।

প্রতিবিম্ব বহুকাল আগের এক ঝকঝকে তরুণ যুবকের।

কবিয়াল মগের তরল পদার্থ গলায় ঢেলে দিয়ে বলে গেল এক বৈচিত্র্যময় করুণ কাহিনী—সে কাহিনী কবিয়ালের হৃদয়ের।

…কৈশোরে পা দিয়েই সব হারাল সোহনলাল। মা বাবা ভাই সব একদিনে একসঙ্গে প্রকৃতির নিষ্ঠুর শাসনে চোখ বুজল। ঠিক যে কি ঘটেছিল তা মনে করতে পারে না ও। পরে অবশ্য সব কিছুই জেনেছে শুনেছে গ্রামের যারা বেঁচেছিল তাদের কাছে। কতবড় বিপদ ঘটেছিল ওদের তা অনুমান করতে পারেনি, পারবেও না সোহনলাল কোনোদিন।

সেবার এক নাগাড়ে সাতদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল। ক'মাস খরার পর আকাশ কালো করে বর্ষা নামায় সবাই খুশি হয়েছিল। প্রথম চারদিন সামান্য বৃষ্টি পড়ার পরই গ্রামের চাষী মানুষ হাল বলদ নিয়ে মাঠে জমিতে নেমে পড়েছিল। সবাই খুশি। পাঁচ দিনের দিন বৃষ্টি বাড়ল। ঝমঝম বৃষ্টি দেখে বয়োবৃদ্ধরা প্রমাদ গুনল। এমন তীব্র বৃষ্টি পড়লে বিপদ হতে পারে নিচের নদীর পারে যারা আছে তাদের। সুতরাং গ্রাম প্রধান সবাইকে সাবধান করে দিল, সময় থাকতে নদীর ধার থেকে পরিবার নিয়ে ওপরে উঠে আসার জন্য।

ছয় দিনের দিন সকালে নদীর চেহারা পালটে গেল। গেরুয়া জলরাশি ফেঁপেফুলে আছড়ে পড়ছে নদীর পারে। অনেকে ঘরদোর ছেড়ে ওপরে পাহাড়ে চলে গেল। যাদের কোনো আস্তানা ওপরে নেই তারা জলের অবস্থা শেষবারের মতো দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সোহনলালের বাবাও থেকে গেল নিচে। রাত হলেই বারবার ঘরের মধ্য থেকে বাইরে নদীর দিকে লক্ষ্য রাখে। মাঝে মাঝে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে নদীর জল কতটা উঠল।

সোহনলালের তখন বছর বারো-তেরো বয়েস। একটানা বৃষ্টির

জন্য শীতটা পড়েছিল খুব। গায়ে মোটামোটা কম্বল চাপিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল সোহনলালের।

বিকট একটা গর্জন আর কোলাহল। মা ওকে ঠেলে তুলে দিয়ে বলল, মোহন পাহাড়ের দিকে দৌড়ে পালা। বন্যা আসছে।

শতশত কণ্ঠের চেঁচামেচি আর কি একটা গর্জনে আতংকগ্রস্থ হয়ে বিছানা কম্বল ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়তে গিয়ে দেখল নদীর দিক থেকে একটা পাহাডের মতো উঁচু জলস্রোত ছুটে আসছে ওর দিকে। মনে হল রূপকথার কোনো দৈত্য বুঝি হুংকার ছাড়তে ছাড়তে তাড়া করছে।

ভয় পেয়ে সোহনলাল প্রাণপণে দৌড়ল। কয়েক পা দৌড়তে না দৌড়তেই পেছনে তাড়াকরা দৈত্যটা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তীব্র ঠাণ্ডা জলের দারুণ স্রোত। ভালকরে সবকিছু বোঝার আগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সোহনলাল।

জ্ঞান হতে দেখল পাহাড়ের ওপরের একটা পাঠশালার ঘরে ও শুয়ে আছে। মুখের সামনে গ্রাম সম্পর্কিত চাচা বীর সিং উৎকন্ঠিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। সোহন প্রথমেই মায়ের খোঁজ করল তারপর বাবার আর ছোট ভাইটার। বীর সিং কি যেন বিড়বিড় করে বলেছিল বুঝতে পারেনি ও।

সুস্থ হবার পর জেনেছিল বিরাট এই জগতে ওর আপনার জন বলতে আর কেউ নেই। অলকানন্দার গর্ভে সব গেছে। একাকী জীবনের অভিশাপ নিয়ে ওকে বেঁচে থাকতে হবে।

চাচা বীর সিং এর ঘরেই আশ্রয় পেয়েছিল প্রথম। তারপর জীবনের চাকা ঘুরেছে। ঝোপড়া থেকে পাকা বাড়িতে আশ্রয় জুটেছে।

বন্যা বিপর্যয়ের পর একদিন লালসাংগার হাকিম সাহেব ওদের গ্রামে এলেন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করতে। সঙ্গে জেলা সদরের অনেক কর্তাব্যক্তি। গ্রামপ্রধান আপ্যায়ন করে তুললেন হাকিম সায়েবকে

পাঠশালার ঘরে। কোনো অতিথি মেহমান এলে পাঠশালার পাকা ঘরেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

হাকিম সাহেব গ্রামে এসেই ক্ষতিগ্রস্থদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। নদীর পার থেকে যারা আগে ভাগে ওপরের পাহাড়ে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছিল তারা জড়ো হল পাঠশালার সামনের মাঠে। বীর সিং চাচার সঙ্গে সোহনলালও এসেছে হাকিমের দরবারে।

গ্রামপ্রধান সোহনলালকে দেখিয়ে হাকিমকে বলল, নদীর পার থেকে যারা ওপরে আসেনি তাদের মধ্যে এ-ও ছিল। বন্যার প্রচণ্ড তাণ্ডবে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, মানুষ জীবজন্তু কেউ রেহাই পায়নি। একমাত্র সোহন প্রাণে বেঁচেছে!

হাকিম সাহেব বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সোহনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, স্ট্রেন্জ! এর কে আছে?

—কেউ নেই হুজুর। মা বাপ ভাই সব মরেছে। বলল বীর সিং।

—কার কাছে আছে এখন?

—আমিই দেখাশোনা করছি হুজুর। নিজের ছ'-সাতটা পেটের দানাপানী যোগাড়যন্ত্র করতে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছি, তার ওপর এর দায়িত্বটাও নিতে হল। বাপ-মা মরা ছেলে না দেখলে আওয়ারা হয়ে যাবে।

হাকিম সাহেব সোহনলালের মুখের দিকে খানিক চেয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, একে যদি আমি নিয়ে রাখি আমার কাছে কারো আপত্তি আছে?

এ যেন না চাইতেই স্বর্গ! বীর সিং একেবারে বোকা হয়ে গেল। গ্রামপ্রধানের মুখে জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজল।

গ্রামপ্রধান বললে, এ-তো উত্তম প্রস্তাব হুজুর। আওয়ারা ছেলেটার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। আমাদের কারো আপত্তি নেই। বীর সিংকে বলে, কিরে বীর সিং বল্না হুজুরকে।

—জী হুজুর। আমারও কোনো আপত্তি নেই।

মত দিয়ে ফেলেই বীর সিং তাকায় সোহনলালের দিকে। কিশোর

ছেলেটার করুণ মুখ দেখে বুকের তলায় একটা বেদনা অনুভব করে। মাত্র কটা দিনেই সোহন নিজের ছেলের মতো হয়ে গেছে। এখন কর্তব্য। যত কষ্টই হোক, সোহনের ভালর জন্য সহ্য করতেই হবে। সাহেবের কাছে থাকলে কালে দিনে একটা কাজটাজ তো জুটবেই।

হাকিম সাহেবের দিকে মুখ তুলে হাত জোড় করে বলল বীর সিং, হুজুর, আমার একটা আরজি আছে।

—বল।

—গরীব আদমী হলেও আমি ছেলেপুলের বাপ। সোহন কটা দিন আমার কাছে থেকে ছেলের মতো হয়ে গেছে। ওকে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসার জন্য ছুটি দেবেন হুজুর।

—নিশ্চয়। যখনি ওর ইচ্ছে হবে চলে আসবে তোমার কাছে। তুমিও এসো আমার ওখানে।

সোহনলাল নিভৃত গ্রাম ছেড়ে একদিন শহরে এলো হাকিম সাহেবের সঙ্গে। এক জীবন থেকে আর এক জীবনে পদার্পণ করল।

লালসাংগার অতিরিক্ত হাকিম সান্যাল সাহেব-এর ছোট খাট ছিমছাম সংসার। স্ত্রী মিনতিদেবী এবং একমাত্র কন্যা লতিকা। আজ ক'বছর হল এ-জেলায় এসেছেন। উনি উত্তরপ্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালী। আছেন তিনচার পুরুষ।

সোহনলাল যেদিন হাকিম সাহেবের সঙ্গে এলো সেদিন বিরাট বাংলো দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কারণ, তার আগে ও এতবড় বাড়ি আর বাগান দেখেনি কখনো। ঘরের আসবাবপত্র দেখে থ'। এত জিনিস কোন কাজে লাগে! হাকিম সাহেবের স্ত্রীকে আর মেয়েকে দেখে কেমন যেন এক শরম ওকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছিল।

সাহেব স্ত্রীকে দেখিয়ে বলেছিলেন, সোহন, এই তোর মেমসাব্।

সোহন সেই প্রথম বড় বড় চোখে মেমসাব্‌কে দেখল। কি সুন্দর দেখতে। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর আর কপালে লাল গোল টিপ। ওর মা কখনো সিঁদুর পরেনি এমনভাবে। তাছাড়া শাড়ি পরতেও

কখনো দেখেনি মাকে। যদিও গ্রামের দু'চারটে মেয়ে বউকে শাড়ি পরতে দেখেছে আগে। তবে তারা এমন সুন্দর করে শাড়ি পরতে পারে না। মনে মনে মেমসাব্‌কে ওর পছন্দই হল। তবে উনি মেমসাব্‌-এর চেয়ে মা হলেই যেন ভাল হত।

সান্যাল সাহেবের স্ত্রী এতক্ষণ সকৌতুকে সোহনলালের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার ভঙ্গী উপভোগ করছিলেন। হেসে বললেন, পছন্দ হল?

সোহন লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করল।

—আমায় মেমসাব্‌ বুলবে না।

সোহন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই উনি বললেন, মা বলবে, কেমন?

সোহনও ঠিক তাই চাইছিল। নিজের মাকে হারিয়ে 'মা' ডাকার কাঙালপনায় ওকে পেয়ে বসেছিল মেমসাব্‌ নিজের থেকে একথা বলায় চোখ দুটো ছলছল করে এলো সোহনলালের।

মিনতিদেবী সোহনলালের চোখ দুটো দেখেই মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, আবার চোখে জল কেন? জামা প্যান্ট ছেড়েনে, খাবার সময় হয়ে গেল যে।

এক বস্ত্রে এসেছে সোহন। দ্বিতীয় কোনো জামা প্যান্ট নেই ওর। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সান্যাল সাহেব হেসে বললেন, বুঝেছি। এখন এটাই পরে থাকুক, বিকালে বাজার থেকে নতুন জামা প্যান্ট কিনে দেব।

মা নিজে ওকে নিয়ে গেলেন স্নানের ঘরে। অবাক হয়ে সেই প্রথম দেখল কল দিয়ে ফোয়ারার মতো জল পড়তে। দেখল সাবান শ্যাম্পু আরো কত কি।

তারপর খাবার ঘরে টেবিল চেয়ার, কাচের পাত্র আর নানা স্বাদের খাদ্য সামগ্রী দেখে হতভম্ব। একটা মানুষ এত রকমের খাবার এক সঙ্গে খায়!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। সব কিছুতে বিস্ময় সোহনলালের। ঘোর কাটতে মাস ঘুরে গেল। আড়ষ্টভাবটা কাটল। ওকে সহজ করে তুললেন মিনতিদেবী আর লতিকা।

মিনতিদেবীর ছেলে ছিলনা। এক মেয়ের পর আর সন্তান হয়নি ওঁর। সোহনলালকে পেয়ে ওঁর ছেলের স্বাদ মিটেছে। ওকে কখনো আশ্রিত বলে ভাবেন নি। মাতৃ হৃদয়ের সব ভালবাসা আর স্নেহ দিয়ে সোহনলালকে নিজের করে নিয়েছেন। সোহনও মা বলতে অস্থির।

সোহনের আড়ষ্টতা কাটলেও ভাষার অসুবিধে কাটেনি। মিনতি-দেবী, লতিকা আর হাকিম সাহেবের মতো বাংলায় কথা বলতে পারে না। যদিও ওঁরা সোহনের সঙ্গে গাড়োয়ালী ভাষায় কথা বলতেন, তবু সোহনের অস্বস্তির শেষ ছিলনা। খাবার টেবিলে ওঁরা তিনজন কি সুন্দর ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেন। সামান্য অনুভব ছাড়া পুরোপুরি বুঝতে পারত না। অস্বস্তি সেই কারণেই।

সোহন একদিন মিনতিদেবীকে বলেই ফেলল, মা, আমায় বাংলা শেখাবেন ?

—বাংলা শেখার শখ হল কেন ?

—আপনাদের কথা বুঝতে পারিনা।

—কেন, তোর সঙ্গে তো গাড়োয়ালী ভাষায় কথা বলি।

এরপর কি জবাব দেবে, কি বলবে গুলিয়ে ফেলল সোহনলাল। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

মিনতিদেবী হাসলেন। বললেন, বাংলা শিখে যাবি এমনিতেই। তোকে ইস্কুলে ভর্তি করব এবার : পড়াশুনা করতে হবে, বুঝলি ?

সোহন খুশি হল। নতুন জীবনের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল ও।

কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণটা বড় দ্রুত এগিয়ে চলে। যৌবনের স্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত সে দুর্বার।

কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিলো সোহনলাল। লতিকা তার অনেক আগেই যৌবনবতী হয়ে সৌরভ ছড়ানো শুরু করেছে।

লতিকা উঁচু ক্লাশের ছাত্রী। মোটা বই পড়ে। সবই ইংরেজী। তবে বাড়িতে বাংলা বইও আছে অনেক। স্কুলের পড়া শেষ করে

বাংলা কবিতার বই নিয়ে সুন্দর আবৃত্তি করে। সোহনলাল একটা চেয়ারে বসে বসে শোনে। ওর ভীষণ ভাল লাগে বাংলা কবিতা। বুঝতে না পারলেও গাড়োয়ালী ভাষার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম মিল থাকায় বুঝতে চেষ্টা করে।

স্কুলে ভর্তি হবার আগে সোহনলালের কাজের চাপ ছিল। বাড়ির দুধ আনতে হত কোতোয়ালীর পিছনের বস্তি থেকে। বাজার হাট আর টুকিটাকি জিনিসপত্র আনার জন্য নিচের বাজারে দিনে বেশ কয়েকবারই যেতে হত। তারপর লতিকাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে সাহেবের চা দুধ কাছারীতে দিয়ে আসতে হত।

বিকালে কাজের চাপ কম। স্কুল থেকে লতিকাকে নিয়ে আসার পর ছুটি আর ছুটি। সে সময় সোহনলাল যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে। কেউ কিছু বলবে না।

লতিকা যখন একা একা স্কুলে যেত তখন ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসত। স্কুলের পোষাক পরিবর্তন করে ফুলের কেয়ারি করা বাগানে ঘুরে বেড়াত আর গান গাইত আপন মনে। সোহনলাল লুকিয়ে লুকিয়ে গান শুনত লতিকার।

হাকিম সাহেব একদিন বললেন, লতু একা একা স্কুলে যায় আসে। ওকে তো সোহন স্কুলে দিয়ে আসতে পারে।

মিনতিদেবী রাজী হতেই আর একটা কাজ বাড়ল সোহনের। প্রতিদিন সকালে লতিকাকে স্কুলে দিয়ে আসা এবং বিকালে নিয়ে আসতে লাগল। ভালই লাগে সোহনের। বিশেষ করে বিকেলটা ওর অদ্ভুত ভাল লাগে।

আগে লতিকা স্কুল থেকে পাকদণ্ডি পথে সোজা বাংলোয় ফিরে আসত। সোহন সঙ্গী হবার পর নিত্য নতুন পথে আসা শুরু হল। সোহনের অচেনা পথ চেনা হতে লাগল। মনে মনে অবাক হত, লতিকা কি করে এতসব পাহাড়ী পথ চিনল।

—এত পথ চিনলে কেমন করে বহিনজী ?

লতিকা কঠিন চোখে তাকাল সোহনের দিকে। বলল, তোমায়

বলেছিনা আমায় নাম ধরে ডাকবে। বহিনজী ফহিনজী ভাল লাগে না শুনতে।

লতিকা সত্যি সত্যি অনেকবার বারণ করেছে বহিনজী বলতে। মা-ও বারণ করেছেন। কিন্তু নাম ধরে ডাকতে কেমন যেন শরম লাগে সোহনলালের। যদিও লতিকা ওর চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। বয়েসটা মা'র কাছেই শুনেছে। মায়ের খুব ইচ্ছে লতিকা ওকে সোহনদাদা বলে ডাকে। কিন্তু লতিকা একদিনও ওকে দাদা বলেনি। হয়তো ওর মতোই লজ্জায় দাদা ডাকতে পারেনি।

এক একদিন ওরা ফিরতে দেরি করলে মা বাংলোর সদর দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন।

—কিরে লতু, এত দেরি হল কেন আজ?

লতিকা বই-এর ঝোলা মা'র কাঁধে ঝুলিয়ে দিতে দিতে বলে, না, তোমার এ-ছেলে একেবারেই নাবালক হাবাগোবা। পাহাড়ী ছেলে পাহাড়ের পথ চেনেনা। সব রাস্তাই নাকি ওর নতুন লাগে। তাই পথ চেনাচ্ছি। আজ ওদিকের পাহাড়ের ধসে যাওয়া পাকদণ্ডিটা দিয়ে এলাম।

মিনতিদেবী বিস্ময়ের ভান করে বলেন, কিরে সোহন, তুই পথ চিনিস না?

সোহন মাথা নীচু করে নীরব থেকে চেনে না স্বীকার করে নেয়।

মিনতিদেবী সস্নেহে বলেন, তাড়াতাড়ি পথ চিনে লতুকে হারিয়ে দে দেখি।

—থাক। তোমার ওই ছেলে আমায় হারাবে তবেই হয়েছে। লালসাংগার পথ চিনতে ওর জন্ম কেটে যাবে।

সোহন আর চুপ করে থাকতে পারে না। অভিমানের সুরে বলে, আমাদের গ্রামের রাস্তা সব চিনি আমি, তুমি সেখানে গেলে তোমায় পথ চিনিয়ে দিতে হবে। লালসাংগায় আগে আসিনি কখনো চিনব কি করে সব।

ঝগড়া লাগে দেখে মিনতিদেবী সোহনকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

লতিকা গজরাতে লাগল রাগে।

মায়ের আগ্রহে সোহনলাল লালসাংগার স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

ভোরের আলো পাইন বীথির ফাঁক দিয়ে বাংলোর আকাশ থেকে অন্ধকার বিদেয় করার সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে পড়ে সোহনলাল। মা আর লতিকাকে ডেকে দিয়ে দুধ আনতে চলে যায়। ন'টার মধ্যে দোকানপাট বাজার সব শেষ করে হাকিম সাহেবকে এজলাসে পৌঁছে দিয়ে বইপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। স্কুল নিচের বাজারের কাছেই। দশটায় বসে তিনটেয় ছুটি হয়ে যায়।

স্কুলের ছুটির পর বই হাতেই চলে যায় লতিকার বড় স্কুলে। তারপর দু'জনে পাশাপাশি হাঁটে। কোনোদিন পাইন দেওদার অরণ্যের মধ্য দিয়ে কোনোদিন অলকানন্দার স্রোতধারার পাশে পাশে পাথর ছড়ান পথে।

সোহনলাল আগ্রহভরে বলে ওর স্কুলের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার কথা। লতিকা উৎসাহ দেয়।

অলকানন্দার ধারে হাঁটতে হাঁটতে একদিন লতিকা বলে, তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে এই নদীটাই গেছে ?

—হ্যাঁ। এ পথ ধরে গেলেই আমাদের গ্রাম পড়বে নদীর ওপারে।

—সত্যি ? একদিন তোমাদের গ্রামে নিয়ে যাবে আমায় সোহন।

—যাবে বহিনজী !

লতিকার আগ্রহের সুর কেটে যায়। থমকে দাঁড়ায়। সোহনলালের মুখে আগুন চোখে তাকিয়ে বলে, আবার ! তোমার সঙ্গে আর কখনো বেড়াতে বেরুবনা দেখো।

সোহনলাল অপ্রস্তুতের একশেষ। চেষ্টা করেও লতিকাকে নাম ধরে ডাকতে পারে না। প্রথম দিন লতিকা রাগ করার পর সোহন পারতপক্ষে আর কোনো সম্বোধন করে ডাকত না। আজ আবার বিস্ময়ের আতিশয্যে বহিনজী সম্বোধন বেরিয়ে গেছে, লতিকাকে

তোয়াজ করার জন্য বলে, আর কখনো বলব না, এবার থেকে নাম ধরেই ডাকব। এই কান মললাম।

সোহনলালের কানমলা খাবার ভঙ্গী দেখে রাগ তরল হয়ে গেল। হেসে ফেলল লতিকা।

নিত্য নতুন বৈচিত্রের মধ্যে দিন কাটে। সোহনলাল পড়াশুনায় মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে। হাকিম সাহেব, মিনতিদেবী আর লতিকা যে যখন সময় পায় পড়িয়ে দেয়, পড়া ধরে সোহনের। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফল আশাতীত দেখে সবাই উৎসাহ নিয়েছে। সোহনলালও পড়াশুনা ছাড়া আর কোনো কিছুতে মন দেয় না।

শরতের পর শীত এসে গেল পাহাড়ে। আকাশে বাতাসে শীতের মিষ্টি শিহরণ। অরণ্যের পত্রপুষ্পে বিবর্ণ ভাব। সাদা সাদা মেঘ উত্তরের আকাশ থেকে ভেসে এসে জমে লালসাংগার আশে পাশে। পাখীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় দক্ষিণের দিকে উষ্ণ অঞ্চলে। অলকানন্দার যৌবনে যেন বার্ধক্যের ছাপ পড়ে। শীর্ণা নদীর তখন রিক্ত অবস্থা।

তুষারপাত শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে চলমান জীবনের ওপর ঘুমের নকশী কাঁথা ঢাকা দেয় কে যেন।

সোহনলাল আর লতিকার স্কুল বন্ধ। সারা দিন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী হয়ে হাঁপিয়ে ওঠে ওরা। এ সময়টায় লতিকা রবীন্দ্র সংগীত আর কাব্যে ডুবে থাকে। পড়ার ঘরে বসে লতিকা আবৃত্তি করে, সোহন কান পেতে শোনে। লতিকা গান ধরলে সোহন গলা মেলাবার চেষ্টা করে। রবীন্দ্র সংগীত আর কাব্যের শব্দ-ঝংকার ও সুর মনের কোণে দোলা লাগলেও, বোঝে না সে ভাষা। না বোঝার যন্ত্রণা ওকে অস্থির করে তোলে।

বাংলা শেখার ইচ্ছের কথা মাকে জানিয়েছিল কিন্তু লতিকাকে জানায়নি কখনো। এই মেয়েটাই ওকে শেখাতে পারে জেনেও কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি। এবার লজ্জা কাটিয়ে লতিকাকেই বলে ফেলল, আমায় বাংলা শেখাবে?

লতিকা খানিক অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থেকে বলে, বাংলা তো বেশ শিখে গেছ। বলতে বলতে আরো শিখবে জিভের আড় কেটে যাবে।

-- কই আর শিখলাম। বাংলা পড়তে পারি না, লিখতেও পারি না। গুরুদেবের গান আর কবিতার মানে বুঝি না। কবিতা আর গান আমার খুব ভাল লাগে। আমায় বাংলা পড়া আর লেখা শেখাতে হবে।

লতিকা রাজী হয়ে গেল। মাষ্টারী করতে পেলে কে আর আপত্তি করে বিশেষ করে ওর মতো বয়েসের ছেলে মেয়েরা।

শুরু হল গুরুশিষ্যের শেখানো আর শেখার পাঠ। উভয় তরফের আগ্রহ কখনো কখনো প্রতিযোগিতার পর্যায়ে চলে যায়। অল্প দিনেই লিখতে আর পড়তে শিখল সোহন। লতিকার কাছে রবি ঠাকুরের পরিচয় জানল। কত গান, কত কবিতা, ছোটগল্প আর উপন্যাস লিখে গেছেন তিনি। কবিগুরুর গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথাও জানল। আরো কত কথা। সোহনলাল যত শোনে ততো অবাক হয়, মুগ্ধ হয়। তাই ভক্ত হতেও দেরি হয়নি ওর।

শীতের ছুটির মধ্যেই সোহনলাল অনেকগুলো কবিতা মুখস্ত করে ফেলল। শিখে নিলো অনেক গান। লতিকা খুশিতে ডগমগ। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ী পথে বেড়ান আর বন্যফুল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে দুটি হৃদয় দুজনের বড় কাছাকাছি এসে গেল।

শীত শেষ হতেই লতিকা একদিন সোহনের সঙ্গে ওদের গ্রামে বেড়াতে গেল। বাংলোর চৌহদ্দির পাহাড় আর দেওদার পাইন অরণ্যভূমি ছেড়ে এত দূরে আর কখনো আসেনি আগে।

উদার প্রকৃতির প্রসাদ সহজ গ্রাম্য জীবন দেখে মুগ্ধ লতিকা। গ্রামের মানুষও দারুণ খুশি। ওদের ছেলে হাকিমের মেয়েকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে এসেছে এতে গৌরব বেড়েছে অনেক। সব থেকে খুশি সোহনের প্রথম আশ্রয়দাতা চাচা বীর সিং। যতক্ষণ

সোহন আর লতিকা গ্রামে ছিল তোয়াজ আর যত্ন-আত্তির চূড়ান্ত করেছে। খাতিরের অন্তরালে ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন দেখেছে বীর সিং।

সোহনলালের সঙ্গে গ্রাম ঘুরে আসার পর ওরা আরো সহজ হয়েছে। সোহন লতিকাকে লতু বলে ডাকা শুরু করেছে। দিনে স্কুলের পিরিয়ড আর রাতের একাকী বিছানা ছাড়া সোহনলাল লতিকার সর্বক্ষণের সহচর।

মাঝে মাঝে হাকিম সাহেবের ট্যুরে যেতে হয় লালসাংগার বাইরে। থাকতে হয় দু'চারদিন সেখানে। সোহনলাল তাঁর বিশ্বস্ত সহচর। সাহেবের খাওয়া দাওয়া দেখাশোনা করতে হয় বলে সোহনলালও থাকে সঙ্গে।

লালসাংগার বাইরে এসে সোহনলাল অনুভব করে একটা অলক্ষ্য পিছুটান। লতিকাও ব্যতিক্রম নয়। সোহন ফিরতে সে কথা বলে লতিকা। সারা দিন ওর কবিতা গান কিছুই ভাল লাগে নি। বিচিত্র বর্ণের গোলাপ আর রডোডেণ্ড্রন যেন বর্ণহীন।

এইভাবে অনেকগুলো দিন মাস বছর অতিক্রান্ত হল। পাহাড়ে রঙের পর রঙ বদলাল। লালসাংগা নাম পালটে আধুনিকতার মোড়কে পুরে হল চামোলি। হল উত্তর গাড়োয়ালের হেড কোয়ার্টার। নতুন নতুন বাড়ি উঠল। সভ্যতা এগিয়ে চলল স্রোতের মতো।

কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে সান্যাল সাহেবের। ওঁর জায়গায় আপগ্রেড হয়ে আসছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কয়েক বছরের মধ্যে। মাথার চুলে অল্পসল্প রুপোলী রেখার উঁকিঝুঁকি। দু'চারটে দাঁতও ইতিমধ্যে নড়বড়ে হয়ে গেছে। মিনতিদেবীও যৌবনের শেষ সিঁড়িতে পা দিয়েছেন। গুচ্ছের মেদ এসে জমা হয়েছে স্নেহের জায়গায় জায়গায়।

এদিকে বয়সের ধর্ম সোহনলালের দেহে যৌবনের জোয়ার এনে দিয়েছে। ছিপছিপে ফর্সা চেহারার কিশোর এখন সুগঠিত যুবক। দেহের শিরা-উপশিরায় যৌবনের মদমত্ততা। লাজুক ছেলে আজ সপ্রতিভ। লতিকার যৌবন এসেছে আরো আগেই। এখন দেহের

কানায় কানায় যৌবনের জোয়ার যেন উপচে পড়ছে। আগের চেয়ে আরো সুন্দরী হয়েছে। একটু লাজুক। চলায় বলায় লীলায়িত ছন্দের মাধুর্য। অবাক হয়ে দেখে দুজনে দুজনকে। পরিবর্তন বুঝতে পারে উভয়েই। আগের মতো সকলের সামনে সহজ হয়ে মিশতে অথবা ঘুরতে ফিরতে যেন কোথায় একটা শরমের কাঁটা বেঁধে। অথচ একান্ত নির্জনে ওরা সহজ—উচ্ছল।

বিকালবেলায় পাহাড়ী উৎরাই পথে ওরা নেমে আসে দুজনে। অলকানন্দার যে দিকটা বেশি উচ্ছল আর নিরিবিলি, সে দিকে গিয়েই বসে দুজনে। কথার পিঠে কথা বলে যখন কথা শেষ হয়ে যায় তখন সোহনের কাঁধে মাথা রেখে গান গায় লতিকা। সোহন গলা মেলায়। শেষে দুজনে গলা মিলিয়ে রবীন্দ্র সংগীত গায়।

কোনোদিন আবার পাইন-দেওদার অরণ্যের ওদিকে যায়। দুজনে কাড়াকাড়ি করে ফুল তোলে। সোহনলাল ফুল দিয়ে সাজায় লতিকাকে। লতিকা গান গায়। সোহন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে তার মানসীকে।

দিনগুলো কাটছিল বেশ। হঠাৎ একদিন হাকিম সাহেব ডাকলেন সোহনলালকে। বললেন একটা পোষ্ট ক্রিয়েট হচ্ছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে। এই তহশীলেই হবে। মাইনে মন্দ নয়, তবে ভবিষ্যতে উন্নতি আছে। চেষ্টায় থাকলে আর পরীক্ষা দিতে পারলে রেনজার পর্যন্ত ওঠা যায়। করবি চাকরীটা?

কি চাকরী কেমন চাকরী ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি সোহনলাল। কেবল মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়েছে। সাহেবের মুখের ওপর না বলা অসম্ভব। চাকরী করার ইচ্ছে এই মুহূর্তে একেবারেই নেই।

চাকরীর কথাটা সেদিনই সাহেব বললেন মিনতিদেবীকে। মিনতিদেবী অবাক। বললেন, সোহন পড়াশুনো করছে। ওর আবার চাকরীর দরকার কি? ওকি তোমায় কাজের কথা বলেছে?

—না না, ও বলবে কেন। ওর চাচা বীর সিং প্রায়ই আসে।

বলে একটা কাজকর্ম করে দিতে। ওকে কথা দিয়েছিলাম আঠারো বছর হলেই একটা কাজ যোগাড় করে দেব সোহনকে। তাছাড়া আমার রিটায়ারমেন্ট-এর সময় তো হয়ে এলো। কোথায় কবে চলে যাই তার ঠিক নেই। শেষে ব্যাচারা ভুগবে সারা জীবন। হাতে ক্ষমতা থাকতে থাকতে ওর ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

মিনতি দেবী গুম হয়ে গেলেন। লতিকা বিমর্ষ।

চাকরী হল সোহনলালের বন বিভাগে। রেনজারের সঙ্গে বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবার চাকরী। প্রথম কটা মাস চামোলি থেকে গোপেশ্বর পর্যন্ত। মন্দ লাগে না অচেনা প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে। সপ্তাহে এক-দু'দিন বাইরে থাকতে হয়। চামোলিতে যেদিন ফিরতে পারত না সে দিনটাই ওর সবচেয়ে খারাপ লাগে। ভাল লাগে না এ-চাকরী, আবার মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারে না ভয়ে।

সোহনের চাকরী হওয়ায় লতিকা সব থেকে অসুখী। দিনান্তে কর্মক্লান্ত হয়ে ফেরে সোহন। পড়ার ঘরে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে শোনাতে খেই হারিয়ে ফেলে। লতিকা ভয় পায় কোথায় যেন একটা ছন্দপতন হতে চলেছে। যে ক'দিন সোহন গোপেশ্বরে থাকে সে কদিন কবিতা আর গান ওর কণ্ঠ থেকে বিদায় নিয়ে কোন শূন্যে উধাও হয়ে যায় তখন একটা বোবা বেদনা বুকের মধ্যে যেন পাথর চাপা হয়ে থাকে।

সোহনেরও একই অবস্থা। গোপেশ্বরের দিনগুলো বড় বিশ্রী অসহনীয় লাগে। অবসর সময়ে গুরুদেবের কবিতা ওর একান্ত সঙ্গী। মানস চোখে লতিকার মুখ দেখে আর গান গায় আর চামোলিতে ফিরে যাবার প্রত্যাশিত দিনটির লগ্ন গোনে।

সেবার হেড কোয়ার্টার্স লক্ষ্ণৌ থেকে জরুরী কাজের আদেশনামা এলো। ডি-এফ-ও আসছেন বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পরিদর্শনের ব্যাপারে সব বন্দোবস্ত করতে। মাস খানেক ওকে চামোলির বাইরে থাকতে হবে। কথাটা শুনে লতিকা স্তব্ধ। একবার মাত্র সোহনকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি করবে?

সোহনলাল কি জবাব দেবে? নিজের স্বাধীন সত্তা ওর কতটুকু? কর্তার ইচ্ছায় যেখানে কর্ম সেখানে ও কলুর বলদের চেয়ে বেশি কি! বলেছিল, আমার তো এ-চাকরী করার একদম ইচ্ছে নেই, সাহেবকে বলি কি করে?

লতিকা আর প্রশ্ন করেনি। সমাধানের আর কোনো সূত্রও বলে দেয়নি। কেবল সোহনলালকে বিদায়ের দিন নিজের গীতাঞ্জলি আর সঞ্চয়িতা বই দুটি দিয়ে বলেছিল, বই দুটো যত্ন করে রেখো।

যথাসময়ে ডি-এফ-ও সাহেবের সঙ্গে চামোলি থেকে গোপেশ্বর চলে গেল সোহনলাল। উৎরাই পথটার দিকে উদাসভাবে চেয়ে রইল লতিকা। বুকের মধ্যে চাপা একটা ব্যথা অনুভব করল সোহন। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না।

এক মাসের জায়গায় ছয় মাস ওকে কাটাতে হল দুর্গম পাহাড়ের বনবাদাড়ে। এক মন্ত্রী যান তো আর এক মন্ত্রী আসেন। মন্ত্রীদের পরে আসেন ছোট বড় নানা সাহেব। খোদ দিল্লী লক্ষ্ণৌ থেকেও সাহেবরা এসেছে।

ছয় মাস বাদে সোহনের ছুটি মিলল! লতিকা—লতুর কথা ভাবতে ভাবতে শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। যৌবনের চকচকে জৌলুস বিবর্ণ। দীর্ঘ দিনের অদর্শনে বুঝতে পেরেছে আকুলতার মূল কোথায়। যেদিন প্রথম বুঝতে পারল সেদিন থেকে সোহনলাল স্বপ্ন দেখতে লাগল। অনেক সুখের জাল বুনতে লাগল মনে মনে। লতিকাও নিশ্চয় ভাবছে ওর কথা। স্বপ্ন আর সুখের জাল বোনার কথাটা এবার বলবে লতুকে।

দীর্ঘ কালের অনুপস্থিতির পর চামোলিতে ফিরল সোহনলাল। চামোলি কত পালটে গেছে। নতুন নতুন বাড়ি-ঘর উঠেছে। চায়ের দোকান এখন রেস্তোঁরা হয়েছে। নড়বড়ে বেঞ্চ-এর পরিবর্তে টেবিল চেয়ার এসেছে। নতুন মানুষেরও আনাগোনা বেড়েছে।

বাজার থেকে তহশীল-কোর্টএর কাঁচা পথ পাকা হয়েছে। অনায়াসে ওপথে এখন জিপ যেতে পারে। চড়াই পথটা খুবই সরল

মনে হল। যেন এক লাফে হাকিম সাহেবের বাংলোয় পৌঁছে যাবে বলে মনে হল ওর।

লালকাঁকর বাঁধানো পথটার শেষে কাঠের গেট। গেট পেরিয়ে কেয়ারী করা ফুলের বাগান। বাগানের শেষে বারান্দা তারপর পাশা-পাশি ঘর। বাঁদিকের ঘরটা লতুর পড়ার ঘর। লতু নিশ্চয় ও ঘরেই পড়ছে। কি পড়ছে? কবিতা? কবিগুরুর কোন কবিতাটা?

ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে পড়ে সোহনলাল। লাল পাথরের রাস্তার শেষে গেট-এর সামনে এসে দাঁড়ায়। গেটের ওপর একটা নেম প্লেট। হঠাৎ চমকে ওঠে। সোহনের দৃষ্টি বাধা পায় গেট-এর ফ্রেমে আঁটা নেম প্লেটটায়। চোখ দুটো ঝাপসা লাগছে ওর। এ কার নাম! মিঃ এ. বি. সিং, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট! সহকারী হাকিম মিঃ সান্যাল তাহলে কোথায়? কোথায় লতিকা—লতু?

এক দৌড়ে তহশীল অফিসে গিয়ে পুরনো বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করল। বড়বাবু বললেন, সান্যাল সাহেব মাস চারেক হল লক্ষ্ণৌ বদলী হয়ে চলে গেছেন। রিটায়ার করার সময় হয়ে গেছে তাই বদলীটা খোদ রাজধানীতেই হয়েছে। পারলে একবার দেখা করিস সোহনলাল। যাবার সময় তোর অনেক খোঁজ করেছেন। আমরা সবাই চেষ্টা করেও তোর হদিশ করতে পারিনি, তুই কোন জংগলে আছিস।

কবিয়াল থামল। ওর কাহিনীর গভীরে আমি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত—বিমূঢ়।

—গুরুজী, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আর একটু রাম দেবেন? বড় পিপাসা। ভীষণ জ্বালা।

বোতল থেকে বেশ খানিকটা রাম ঢেলে দিলাম ওর মগে।

—তারপর কবিয়ালজী?

কাঁচা উত্তপ্ত গরলটা গলায় ঢেলে দিল কবিয়াল। মুখ চোখ বিকৃত করে হিক্কা থামাল। তারপর শান্ত হয়ে বলল কাহিনীর শেষ অংশটা।

…সেদিনই সোহনলাল লক্ষ্ণৌ যাত্রা করল। দু'দিন বাদেই বিরাট সেই রাজধানীতে পৌঁছল। খোঁজ নিল মহাকরণে। সেখানে হতাশ হল ও। সান্যাল সাহেব রিটায়ার করে কলকাতা চলে গেছেন, জীবনের শেষ দিনগুলো বাংলাদেশে কাটাবেন বলে। হাতে পয়সা-কড়ি ছিলনা। ছিলনা সান্যাল সাহেবের কলকাতার ঠিকানা। তবু রেল গাড়িতে চেপে বসল এবং বেনারসে ধরা পড়ল বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ করার দায়ে। একটা মাস শ্রীঘরে কাটিয়ে পাহাড়ে ফিরে এলো সোহনলাল।

চামোলিতে এসে ওর মনে হল জায়গাটা অসহ্য। কারণ এখান থেকেই হাকিম সাহেব ওর হৃদয়ের মূল্যবান অংশটুকু কেড়ে নিয়ে বদলী হয়ে গেছেন। বোবা কান্নায় ভেতরটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। সোহনলাল তারপর থেকেই হৃদয়শূন্য। লতিকার দেওয়া গীতাঞ্জলি হৃদয়ের শূন্য স্থানে সযত্নে রেখে সেই যে মানুষের সমাজ ছেড়েছে তারপর আর সেখানে ফিরে যায়নি। গুরুদেবের কবিতায় শান্তি খুঁজেছে—আশ্বাস চেয়েছে জীবনের।

নাটকীয় ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল কবিয়াল। হাত জোড় করে বলল, আমার গুরুদেবের দেশের মানুষের জন্যে কিছু করতে পারলাম না। আমায় ক্ষমা করবেন গুরুজী।

উঠে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল কবিয়াল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরা পাহাড়ী উপত্যকায় তার বেসুরো কণ্ঠের গান ভেসে এলো—"জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে…"

একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো আমার জমাটবাঁধা বুক থেকে। অন্ধকারের বুক চিরে বেসুরো গলায় যে বেদনার সুর ভেসে আসছে তা সোহনলালেরই। সোহনলাল আর কবিয়াল যে এক এবং অভিন্ন। তার সঙ্গে নিজের কোথায় যেন এক আত্মিক সম্বন্ধ অনুভব করলাম।